ত্রিকাল

ত্রিকাল

হুমায়ুন প্রেস
কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

মূল্য ১৷৷০

আতাওয়ার রহমান ও ফয়জুল কবির
সম্পাদিত

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা হইতে
ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উৎসর্গ

নীলিমা দেবী

শান্তি কবির

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচী

	পৃষ্ঠা
খাজা আহ্মদ্ আব্বাস	
জওহরলাল নেহ্রু	১
নিখিল চক্রবর্তী	
জাতীয় ঐক্য	৯
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
ম্যাজিক	২১
বিষ্ণু দে	
এক চৈনিক যক্ষের গান	৩৬
জীবনানন্দ দাশ	
চক্ষুস্থির	৩৮
অমিয় চক্রবর্ত্তী	
ইরাণ	৩৯
হরপ্রসাদ মিত্র	
পুনর্মিলন	৪১
হুমায়ুন কবির	
ভারতীয় চিত্র	৪২
বুদ্ধদেব বসু	
ব্ল্যাক আউট	৪৭
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
মুখে ভাত	৫২
শান্তিদেব ঘোষ	
রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজনা পদ্ধতি	৬২
শওকত ওস্মান	
প্রমথ চৌধুরী	৭৪
সুধীরকুমার চৌধুরী	
অসি	৭৮
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	
বাংলা সিনেমা	৮১

সূচী

	পৃষ্ঠা
অন্নদাশঙ্কর রায়	
ঝাঁপ	৯০
হবিবর রহমান	
আবুল কাসেম ফজলুল হক	১১৭
অরুণ মিত্র	
রূপান্তর	১২৩
সমর সেন	
জানুয়ারী, ১৯৪২	১২৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
গ্রামে	১২৬
দিনেশ দাস	
ব্যাঙ্ক	১২৭
নবগোপাল দাস	
এপিঠ ওপিঠ	১২৮
ম্যাক্স ইষ্টম্যান	
লিয়ঁ ট্রট্স্কি	১৩৩

'ত্রিকাল' কোন সংস্কারের সমর্থন নয়। এতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখাই যে পাঠকের সহানুভূতি পাবে এ আশা আমরা করি না। একটা নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডিতে বাঙালীর আদর্শকে সীমাবদ্ধ না করে আরো বিস্তৃতভাবে তা'কে পরিচালিত করবে বলেই 'ত্রিকালে'র আবির্ভাব। এতে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত বা অস্বাক্ষরিত কোন লেখারই বিশেষ মতবাদের দায়িত্ব 'ত্রিকাল' গ্রহণ করবে না। 'ত্রিকালে'র উদ্দেশ্য শুধু লেখকদের মতবাদকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা।

—সম্পাদক

খাজা আহ্মদ্ আব্বাস

জওহরলাল নেহ্রু

"I have been one of a mass, moving with it, swaying it occasionally, being influenced by it, and yet, like the other units, an individual, apart from the others, living my separate life in the heart of the crowd ..."

"I often wonder if I represent any one at all, and I am inclined to think that I do not ... I have become a queer mixture of the East and West, out of place everywhere, at home nowhere. Perhaps my thoughts and approach to life are more akin to what is called Western than Eastern, but India clings to me, as she does to all her children, in innumerable ways ... I am a stranger and an alien in the West. I cannot be of it. But in my country also, sometimes, I have an exile's feeling."

JAWAHARLAL NEHRU
in his "Autobiography"

জওহরলাল খেয়ালী মানুষ। কতকগুলো মানসিক অবস্থা দিয়ে তিনি তৈরী। একবার নিষ্ঠুর আত্মসমালোচনার সুরে তাঁর জীবন-চরিতে লিখেছিলেন যে তিনি কারুই প্রতিনিধি নন, কারু সঙ্গেই তাঁর মিল নেই।

একদিক দিয়ে বলতে গেলে সম্ভবত তিনি ঠিকই বলেছেন। জওহরলাল প্রাচ্য ভাববাদ ও প্রতীচ্য বৈষয়িকতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ—ধর্ম্ম, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত সোচ্চার মতবাদের জন্যই তাঁকে গান্ধীজির মতো ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা যায় না। মহাত্মাজির ব্যক্তিত্ব ভারতীয় চাষীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ঊর্দ্ধযাত্রারই রূপান্তর। তাতে আছে পাশ্চাত্যের যন্ত্র ও নূতনত্বের উপর বিদ্বেষ, জমির প্রতি আকর্ষণ, প্রাচীনতার পথে বস্তুর মূল্যনির্ণয়, ধর্ম্মের প্রতি এমন কি কুসংস্কার এবং ধর্ম্মাচারের প্রতিও অপরিসীম অনুরাগ। কিন্তু জওহরলাল নাস্তিক, মনুর চেয়ে মার্ক্সের বাণীর উপরই তাঁর বিশ্বাস বেশি, পুরোপুরি আধুনিক মন তাঁর বিমান-ভ্রমণেরই পক্ষপাতী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কারখানা (যদিও রাষ্ট্র-পরিচালিত) বসিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে যন্ত্রশিল্পের দেশ করে গড়ে তুলতে চান পুরোনো

লাঙলের বদলে ক্ষেতে চল্‌বে ট্র্যাকটর, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আর রেডিয়োতে দেশ ছেয়ে যাবে, যাতায়াতের আর সংবাদ সরবরাহের পথ সুগম হয়ে উঠ্‌বে।

জওহরলাল আশ্রমের মাটির ঘরে আস্তানা নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা উপাসনায় যোগ দিচ্ছেন—এমন কল্পনা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। বরং এমন কল্পনাই তাঁর সম্বন্ধে খাটে যে তিনি একটি আধুনিক অফিসের কামরায় বসে আছেন—কাচ দেওয়া টেবিলের উপর একজোড়া টেলিফোন, দেয়ালে পৃথিবীর মানচিত্র, ঘরের এক কোণে একটি রেডিয়ো-সেট, অন্য কোণে একটি টেলিপ্রিণ্টার, আমেরিকার কোনো বড় ব্যবসায়ীর মতো তিনি রুটিন-মাফিক অফিসের কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন—ছুটির দিন কাটে তাঁর স্কিইং-এ আর পাহাড়ে চড়ে।

যে ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীতে আছে কুঁড়ে ঘর, মন্দির, আশ্রম আর নগ্ন ফকির—এ ছবি সে-দেশকে প্রতিফলিত করে না।

নিজের সম্বন্ধে তিনি যা-ই বলুন না, আমাদের মনে হয়, বর্তমান ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বল্‌তে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বোঝায় না, এমন কি গান্ধীজিকেও নয়। ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে কিন্তু এ কথা আমি না মেনে পারিনে যে সেবাগ্রামের ঋষি অজস্র লোকের প্রতিভূ হলেও অতীতে চলে গেছেন। তাঁর প্রভাব আমরা বংশপরম্পরায় অনুভব করব কেননা তিনিই আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছেন, জাতীয় আত্মসম্মানের মর্যাদা শিখিয়েছেন, আর মুক্তির সংগ্রাম চালাবার জন্যে দিয়েছেন অস্ত্র। তাঁর কাজ মহৎ আর অমর হলেও তা করা হয়ে গেছে। যদি যুবশক্তির উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাহলে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ জওহরলালের উপরই ন্যস্ত। তরুণদলের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা এবং ধৈর্য্যহীন আদর্শবাদেরই তিনি অংশীদার নন, অন্তরে তিনি সে সব প্রগতিশীল, বেগবান শক্তি ও লক্ষণেরও পরিপোষক যা দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ তৈরী হবে।

রাজনৈতিক মতবাদের জন্য যতটা নয় ততটা তাঁর তারুণ্যের জন্যই জওহরলাল আমাদের মত যুবকের কাছে প্রিয়। এই তারুণ্য বয়েসের

অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বয়েস প্রায় তিপান্ন, ভারতীয় মানে যাকে বৃদ্ধবয়সও বলা যেতে পারে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর চেয়ে বয়েসে ছোট কিন্তু তাঁদের মনের, দাড়িতেও পাক ধরে গেছে। কিন্তু জওহরলাল মননক্ষেত্রে চিরদিনের মতই সতেজ, জীবনের ডাকে সাড়া দিতে যুবকের মতই তিনি উদগ্র, সত্যিকারের কাজে উৎসাহ তাঁর এখনো অনির্ব্বাণ আর দুঃসাহসিকতার আগুনও তাঁর নিভে যায় নি। এই সেদিনও তিনি কাশ্মিরে গ্লেসিয়ারের উপর উঠে তাঁর ভক্ত আর অনুচরদের অবাক করে দিয়েছিলেন—অন্তত তাদের একজন ত' তাতে আনন্দে রোমাঞ্চিতই হয়ে উঠেছিলেন। সর্ট-পরা, গরম টুপি মাথায়—পাহাড়ে ওঠার তাঁর একটা ফটো দেখে আমি তার প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করেছি। এমন যদি হয় দুজন নেতার মধ্যে একজনকে আমার পছন্দ করতে হবে, অন্য সব বিষয়ে সমান হয়েও যাঁদের একজন সম্ভ্রান্ত শেরওয়ানি বা ধুতি কোর্ত্তা পরেন, চরকা কেটে দিন কাটান আর অহিংসা ও ব্রহ্মচার্য্যের আলোচনা করেন, আর অপর জন বরফ-ঢাকা খাড়া পাহাড়ে উঠতে যান—পরের জনকেই আমি পছন্দ করব। রাজ-নীতির পাহাড়ে উঠবার আঁকাবাকা, বিপদসঙ্কুল পথে তাঁর সঙ্গে থেকেই আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করব।

বয়োবৃদ্ধ নেতাদের 'কৌশল' ও 'মর্য্যাদা'র সার্থক অভাব দেখা যায় জওহরলালে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং-এও তিনি অস্বাভাবিক সম্ভ্রান্ততার ভাব ধারণ করে থাকেন না—যেমি আমাদের নেতারা করে থাকেন। কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে আমি দেখেছি ঘোড়ার চড়ার মতো করে পা ছড়িয়ে তিনি কুশনে বসে আছেন: একটা মিটিং-এ তাকে দেখেছি রিপোর্টারের টেবিলের উপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ভীড় সরাচ্ছেন, দেখেছি বারবার প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে তিনি রিপোর্টারের উপর রেগে উঠেছেন, নিজের ক্যামেরা দিয়ে সহকর্মীদের ফটো তুলছেন আর বক্‌বক্‌ করছেন ছোট ছেলেদের মতো—একটা নতুন পুতুল পেলে তারা যেমি করে। সাধারণতঃ কংগ্রেসের সভাপতি গাড়ী করেই অধিবেশনে যান কিন্তু লাহোরে তিনি চড়লেন ঘোড়া যা আর কেউ করেন নি। তিন

বছর আগে তিনি নিজে পরলেন খাকী আর পণ্ডিত পন্থ ও পণ্ডিত কুঞ্জরুর মতো পূজনীয় ব্যক্তিদের সর্ট-সার্ট পরিয়ে নিয়ে চললেন দীর্ঘভ্রমণে যখন তিনি যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস সেবকদল তৈরী করছিলেন। বয়স তাঁকে ম্লান করে দিয়েছে, দীর্ঘ কারাবাসের ছায়া পড়েছে তাঁর দেহে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি তেমনি সতেজ আর তরুণই আছেন। কারামুক্তির পর যদি তিনি পাহাড় চড়তে যান, বিমান চালনা শেখেন বা ভারত রক্ষার জন্য ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করেন আমি একটুও বিস্মিত হব না।

এ ধরণের জীবন-সম্ভোগ, কাজের ও ভ্রমণের এ প্রেরণা কেবল তাঁর জীবন সম্বন্ধে যুবকসুলভ আধুনিক ধারণার দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এর উদ্ভব তাঁর ধ্বংস-প্রবণ মন থেকে যা প্রাচীনত্বের মাপকাঠিতে কোন কিছু গ্রহণ করতে নারাজ, এর উদ্ভব জীবনের দৃশ্যাবলী দেখবার তীব্র উন্মুখতা থেকে—তা তিনি স্প্যানিশ কমরেডদের সঙ্গে বার্সিলোনায় বিমান-আক্রমণই দেখুন কিম্বা ঊর্দ্ধগামী এরোপ্লেনেই চড়ুন।

এই মানসিক বৃত্তিই লক্ষ্য করবার বিষয়, তার বাহ্যিক প্রকাশ নয় এবং এ থেকেই বলা যায় জওহরলাল নেহরু নবীন ভারতের প্রতিনিধি।

জওহরলালের জীবন-সম্ভোগ থেকেই সুরু করা যাক আর তার তুলনা করা যাক মহাত্মা গান্ধীর সন্ন্যাস ধর্ম্মের সঙ্গে। সেই সন্ন্যাসীর কাছে সরলতাই আদর্শ, সরলতাই সরলতার উদ্দেশ্য। এই সমাজতান্ত্রিকের কাছে সরলতা হচ্ছে দরিদ্রের পার্থিব জীবনের উন্নতি সাধন করবার উদ্দেশ্যে তাদের জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে সমীকরণ করবার উপায়। সাদাসিধে ধুতিকাপড় জওহরলাল অস্বাভাবিকতা দেখাতে চান না। হাতে বোনা কাপড় ব্যবহার করলেও, ভালো পোষাকই তাঁর পছন্দ, পরিচ্ছন্ন ছিমছাম থাকতেই তিনি ভালোবাসেন। কন্টিনেণ্টে তাঁকে দেখেছি য়ুরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ সচ্ছন্দে তিনি পরেছেন, তাতে আত্ম-সচেতনতার বালাই নেই। ভারতবর্ষে তিনি খদ্দরের ধুতি ও কোর্ত্তাই পরে থাকেন যেহেতু ভারতের জনসাধারণের তার চেয়ে বেশি কিছু ব্যবহার করবার সাধ্য নেই। তাদের জীবনধারণের প্রণালী যখনই খানিকটা উঁচুতে তোলা সম্ভবপর হবে—আমার মনে হয় তখন তিনি ইচ্ছা করবেন সবাই

একটু ভালো কাপড়চোপড় পরুক—পাশ্চাত্য পোষাকেও হয়ত তাঁর আপত্তি হবে না। গান্ধীজির মতো তিনিও তৃতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করেন কিন্তু ভীড় থাকলে রাত্রিতে ঘুমোবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে টিকিট বদল করে নেন। একে ভাণ বা আত্মসুখ বলা যায় না। দিনে এক ডজন মীটিং-এ বক্তৃতা দেবার জন্য যাঁকে অনবরত ভ্রমণ করতে হয় তাঁর পক্ষে এ সম্পূর্ণ শোভন ও যুক্তিপূর্ণ। রাত্রিতে তাঁকে স্বাস্থ্য নষ্ট করে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে বলা যেমন মূর্খতা তেম্নি আত্মঘাতী।

জীবনের সরল আনন্দগুলোকে বা সৌন্দর্য্য আস্বাদনকে জওহরলাল বাদ দেন নি। তিনি ধূমপান করেন, সময় থাকলে ভালো ছবিও দেখেন, বেশ উৎসুক হয়ে মেনকা ও উদয় শঙ্করের নাচ দেখতেও তাঁকে আমি দেখেছি।

যা হওয়া উচিত এ তা-ই। নিজেদের সম্বন্ধে অকপট হওয়া যাক ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, পূজাও করে অনেকটা, কিন্তু তারা তাঁর ধর্ম্মজীবনের অংশ গ্রহণ করতে অপারগ, তাঁর আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের রূপান্তর তারা বুঝতে অক্ষম। যুবকদের কাছে ত' এ বস্তু অগ্রাহ্যই। অন্যান্য জাতির মতো আমরাও বাঁচতে চাই, আমাদের পরিমিত সংস্থানের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ উপভোগ করতে চাই, ভালো পোষাক পরতে চাই, চাই হাস্‌তে, ভালোবাস্‌তে, ভালো-বাসা পেতে। সিনেমার অপকারিতা সম্বন্ধে গান্ধীজি যাই বলুন না, ভারতবর্ষের বারো'শ' চিত্র-গৃহে রোজই ভীড় হচ্ছে, কেননা জনসাধারণ এর চেয়ে সস্তায় আর কোথাও আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। জওহর-লালের শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি এমনই পরিমার্জ্জিত যে তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধের পক্ষে ভারতীয় এমনকি বিদেশী চিত্রেরও সাধারণ মান অত্যন্ত নীচু স্তরের কিন্তু উদ্দেশ্যটাই এতে আসল এবং আমার মতো হাজার হাজার যুবক এমন নেতাকেই পছন্দ করবে সিনেমার উপর যিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন না বা যিনি জীবনের নির্দ্দোষ আনন্দকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে ভাবেন না।

যে ইচ্ছা মানুষকে নৈতিক ধর্ম্ম না শিখিয়ে সুখসমৃদ্ধি দিতে চায় সেই যুক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈষয়িকতাই জওহরলালের অর্থনৈতিক সমস্যা বিচারের দিকটাকে সূচিত করে। তাঁর কাছে খদ্দরের নৈতিক মূল্য নেই, যতটা

আছে অর্থনৈতিক মূল্য। হাতেবোনা মোটা কাপড় পবে কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কবে একথা তিনি বিশ্বাস কবেন না, তিনি ববং মনে কবেন এতে জনসাধাবণেব শোচনীয় দাবিদ্র্যেব একটা সামযিক সমাধান হ'তে পাবে মাত্র। একে বলা যেতে পাবে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিকতাব খানিকটা প্রতিষেধক।

তাঁব আগেও কযেকজন কম্যুনিষ্ট এবং সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনৈতিক সূত্রে আন্দোলন চালিযেছিলেন কিন্তু জওহবলালই ভাবতীয জাতীযতাব বন্যাকে অর্থনীতিব পথে নিযে গেছেন। তাব আগে পর্য্যন্ত এবং কতকটা এখনও কংগ্রেস আন্দোলনে অতিন্দ্রিযতাব, অর্দ্ধ-ধার্ম্মিকতাব আব কলহাত্মক স্বাদেশিকতাব বং মেশানো ছিল। বাজনৈতিক বক্তৃতায এমন সব কথা ব্যবহৃত হত যা হিন্দুধর্ম্মেবই অন্তর্ভুক্ত, যেমন—ভাবতমাতা, বন্দেমাতবম্‌, বামবাজ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ। ১৯২০-২১-এব অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম মুসলমান-ধর্ম্ম-বিশ্বাসেব ছোঁওযা লাগে—কংগ্রেস একটা বিদেশী ধর্ম্মান্দোলনেব সঙ্গে নিজেকে জডিত কবে ফেলে, তা হ'ল তুর্কী খিলাফৎ। কংগ্রেসে যখন প্রগতিপন্থীদেব আবির্ভাব হ'ল, তখন তাঁবাও আইবিশ বিপ্লবীদেব সিনফিন প্রণালীব বাইবে দৃষ্টি প্রসাবিত কবতে পাবলেন না।

জওহবলালই প্রথম "ভাবতবর্ষেব অগণিত অর্দ্ধনগ্ন ছেলেমেযেব দুঃখ দেখে" জনসাধাবণেব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্বাধীনতাব ব্যাখ্যা কবলেন। এবং গোড়াকাব অধিকাব সম্বন্ধে বিখ্যাত কবাচী সিদ্ধান্ত এনে কংগ্রেসকে দিযে সমাজতন্ত্রগত অর্থনৈতিক কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ কবালেন। তখন থেকে তিনি এই মতই পোষণ কবে এসেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে সমাজতন্ত্রেব এবং জাতীযতাব লক্ষ্য নিযে সংগ্রাম চালাতে হবে।

জওহবলাল তাঁব সমাজতান্ত্রিক মনকে কোথাও গোপন কবেন নি। জীবনচবিতে তিনি বলেছেন "আমাব কাছে সমাজতন্ত্রবাদ একটা অর্থনৈতিক মতবাদ মাত্র নয। এ একটা জীবন-ধর্ম্ম যা আমি মগজে এবং হৃদযে বহন কবি।" তিনি গণতান্ত্রিক এবং কঠোব শৃঙ্খলাব পক্ষপাতী, কিন্তু কংগ্রেস পবিত্যাগ কববাব সঙ্কল্প তাঁব নেই, কংগ্রেসকে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শেব পথে আনতে চান। অর্থনৈতিক বিষযে কংগ্রেসেব মনোযোগ বাড়িযে দিযে তিনি ইদানীং কংগ্রেস-ভুক্ত বহু ধনিককে অপ্রতিভ কবে দিযেছেন।

দরিদ্রের প্রতি গান্ধীর সহানুভূতি সংশয়াতীত, তিনি অনবরতই ধনী, জমিদার আর কলের মালিকদের কাছে আবেদন করছেন যাতে তাঁরা চাষী মজুরদের উপর সদয় ব্যবহার করেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই ভারতবর্ষেও ধনী ও দরিদ্র, জমিদার ও চাষী, ধনিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধটাকে সহৃদয় অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে চালিয়ে নেওয়া যায় না।

কৃষক-আন্দোলন আর ট্রেড ইউনিয়ন ভারতবর্ষের জমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম যতই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠবে, ততই জন-সাধারণ সমাজতান্ত্রিক নেহরুকে নেতা রূপে পেতে চাইবে কারণ তাদের দাবী পূরণের জন্য তিনি সব সময়েই অটল দৃঢ়তায় দাঁড়িয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক হিসেবে বর্তমান জগতের সমস্যাগুলোকে বিশদভাবে অনুধাবন করেছেন বলে নেহরুর একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা গান্ধীর নেই। ভারতীয় সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তিনি জাগতিক পরিস্থিতিরই পরিপ্রেক্ষিতে। বক্তৃতার এবং লেখায় এ দৃষ্টি নিয়েই তিনি ভারতবর্ষের অবস্থান্তরের ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁর জন্যই আজ আমরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার দৃষ্টি বর্জন করতে শিখেছি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। মহাত্মা গান্ধী মানবতাধর্মী এবং শান্তিবাদী, তাই তাঁর বৈদেশিক নীতিতে তীব্রতার ঝাঁঝ নেই। কিন্তু তাঁর এ মতবাদ থাকা সত্ত্বেও বহু জাতীয়তাবাদীই ব্রিটিশবিরোধী বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে হিংস্র বিপ্লব সংঘটন করাবেন আশা করেছিলেন। ১৯১৪-১৮-তে সে শক্তি ছিল কাইজারের জার্মেনী। সম্প্রতি হিটলার মুসোলিনির দিকেও আশাপূর্ণ বহু দৃষ্টিই পড়েছিল। কিন্তু এ-ব্যাপারে সঠিক ইঙ্গিত দেশকে জওহরলালই দিয়েছেন। হাজার হাজার বক্তৃতামঞ্চ থেকে, বহু সাময়িক পত্রিকার স্তম্ভ থেকে তিনি দেশবাসীকে পৃথিবীর সমস্যাপূর্ণ অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্লেষণ করলেন ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী মতবাদ, তাদের সর্বনাশা যুক্তি উদ্‌ঘাটিত করে দেখালেন এবং এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন যেন কেউ নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট খর্পরে গিয়ে না পড়ে।

নেহরু আন্তর্জাতিক অবস্থা শুধু অনুধাবনই করেন নি, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধও স্থাপন করেছেন। য়ুরোপের সর্বত্র ভ্রমণ করে তিনি প্রথমত

সেখানকার অবস্থা বুঝে নেবার সুযোগ পেয়েছেন, তারপর সেখানকার প্রগতিশীল নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মত ও চিন্তার আদান প্রদান করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষের বেসরকারী রাজদূত হিসেবে বিমানপথে যখন তিনি বার্সিলোনায় যান, তখন স্পেন ফ্র্যাঙ্কো আর তাঁর ফ্যাসিষ্ট নাৎসী সাঙ্গো-পাঙ্গদের সঙ্গে বিফল অথচ বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তারপর তিনি যান চুংকিং-এ চীনের বীর সৈনিকদের নিকট ভারতবর্ষের শুভাকাঙ্ক্ষা পৌঁছে দিতে। এমন যে মানুষ, যে-কেউ মনে করতে পারে, তিনি অনায়াসে রুজভেল্ট, চিয়াং কাইশেক, মোলোটোভ এবং ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর সঙ্গে এক টেবিলে বসে সমরোত্তর কোনো বৈঠকে পৃথিবীর পুনর্নির্ম্মাণের পরামর্শ করছেন। তাঁদের ভাষায় তিনি কথা বলতে পারবেন, তাঁদের সমস্যা বুঝতে পারবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তরের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কার্য্যকরী নির্দ্দেশও দিতে পারবেন। এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে বিভিন্ন জাতির বৈঠকে বসবার জন্য সম্মানজনক সমান আসনও তিনি দেশের জন্য নিয়ে আসতে পারবেন।

❖

নিখিল চক্রবর্ত্তী

জাতীয় ঐক্য

জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে আজকাল আমাদের দেশে নানা মত শোনা যায়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথাই হ'ল ভারতীয়দের সকলকে এক জাতি বলে গণ্য করা এবং সেই অনুসারে ইতিহাসকে সাক্ষী মেনে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে বহু শতাব্দী ধরে আমাদের জাতীয়তাবোধের লক্ষণ পাওয়া যায়। আমাদের বিদেশী শাসকরা ঠিক এর উল্টো কথা বলে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য যে ইংরাজ শাসনের ফলেই আমাদের জাতীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছে এবং তার আগে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও গৃহ-যুদ্ধ ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য ছিল। অল্প কিছুদিন ধরে এই বিষয়ে নতুন নতুন মতামতের আবির্ভাব হয়েছে। পাকিস্থান পরিকল্পনাতে আজকে অনেকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করছেন। তাদের পাল্টা জবাব দিচ্ছে 'হিন্দুদের হিন্দুস্থান' ও 'অখণ্ড হিন্দুস্থানের' শ্লোগান। এ অবস্থায় জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সময়-সঙ্গত হবে বলে মনে হয়।

১

ইংরাজদের কথাই প্রথম ধরা যাক্। সরকারী ফরমাসে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে তাতে বলা হয় যে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করছিল—প্রত্যেক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সঙ্গে গৃহ-যুদ্ধে ব্যস্ত থাকৃত, কোনও রকম সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। এরকম অবস্থায় জাতীয় ঐক্যের ধারণা আশা করাই অন্যায়। যদিও মাঝে মাঝে ভারতে বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে, তার কোনটাই স্থায়ী হতে পারেনি, কারণ তাদের মধ্যে সুশাসন ব্যবস্থার অভাব ছিল। তাই সেগুলি নিজেরাও দাঁড়াতে বা দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আদর্শ বদ্ধমূল করতে পারে নাই। এর পরে এল ইংরাজরা। তাদের শাসনব্যবস্থা

ও সভ্যতা-প্রচারই ভারতীয় জাতীয় জাগরণের প্রধান সহায়ক। সমস্ত দেশ এক শাসনব্যবস্থার অধীনে আসাতে গৃহ-যুদ্ধের অবসান হল। পরিবর্ত্তে, ইংরাজরা আমাদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যের বাণী প্রচার করল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুবিচারের ব্যবস্থা—এ' সবই ইংরাজের দান এবং এইগুলির মধ্য দিয়েই আমরা ঐক্যবোধ লাভ করেছি। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হই। এই সংযোগের ফলেই আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রথম দেখা দিল এবং ক্রমে তাই জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনে পরিণত হল। ১৯১৮ সালের Montagu-Chelmsford Report-এ বলা হয়েছে :

"The politically minded portion of the people of India are intellectually our children They have imbibed ideas which we ourselves have set before them, and we ought to reckon it to their credit The present intellectual and moral stir in India is no reproach, but rather a tribute to our work "*

অপর পক্ষে, আমরা শুনতে পাই অন্য কথা। জাতীয়তাবাদীরা বলেন যে ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ নতুন নয়: অশোকের রাজত্বকাল থেকে আমাদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ না এলেও, জাতীয়তাবোধ রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাঝে মাঝে হয় ত গৃহ-যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু, বস্তুতঃ, ভারতীয়রা সকলে একটি জাতিরই সভ্য। যদিও নানা দেশ থেকে, নানা সভ্যতা নিয়ে নানা জাতির লোক এ দেশে এসেছে, তবু তারা প্রত্যেকেই এখানে এসে ভারতীয় জাতির মধ্যে নিজেদের সত্বাকে মিলিয়ে দিয়েছে। ইংরাজের দাবী সত্য নয়, যদিও এটা ঠিক যে বাইরের অনেক চিন্তাধারা আমাদের আলোড়িত করেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি ইংরাজের শিক্ষা-দীক্ষা নয়, ইংরাজ শাসনের ফলে দেশের যে দুরবস্থা তারই সমাধান করা। পরাধীনতা হ'তে মুক্তির পথ জাতীয় ঐক্যের মধ্যে দিয়ে, তাই আমাদের ঐক্যবোধ। আমাদের ঐতিহ্য ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

*Montagu-Chelmsford Report, 1918, p 115

তই আমাদের ঐক্যবোধ জাগিয়াছে। আজ যদি জাতীয় ঐক্যের উপর আক্রমণ হয়, তাহলে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ক্ষতি হবে। বিদেশী শাসক আমাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ কামনা করে, কিন্তু তার বিপক্ষে আমাদের দাঁড়াতে হবে। জওহরলাল নেহেরু তাঁর নতুন বইতে লিখেছেন :

"The British gave political unity to India This had now become possible owing to the development of communications and transport It was a unity of a common subjection, but it gave rise to the unity of common nationalism The idea of a united and free India gripped the people It was not a superficial idea imposed from above, but the natural outcome of that fundamental unity which had been the background of Indian life for thousands of years The difference that had crept in was the new emphasis on the political aspect To combat this, the British Government tried to lay stress on the religious differences and adopted a policy which encouraged them and brought them into conflict with each other It has had a measure of success, but nationalism, in India as in other countries of the East, is the dominant urge of the time and must triumph "*

তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একদিকে ইংরাজের গর্ব যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তারই দয়াতে সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীদের দাবী যে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভারতবাসীর আপন অভিজ্ঞতাই ঐক্য এনেছে, তাই সবরকমের অনৈক্যের চেষ্টা দমন করতে হবে, কারণ অনৈক্য মেনে নিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২

আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি, জাতি কাকে বলে? জাতীয়তাবোধ কী এবং তা কোন অবস্থায় ফুটে বের হয়? এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমরা

*Nehru Unity of India, 1941, p 19

বুঝতে পারব যে ইংরেজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দাবী কতদূর সত্য এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মতামত কেন আজকে উঠেছে।

জাতি কাকে বলে? প্রথমত, জাতি হল একটি জনসমষ্টি। এই সমষ্টি মহাজাতি বা গোষ্ঠি নয়। আধুনিক ইংরাজরা যেমন, কেল্ট্, রোমান্, অ্যাংগ্লো-স্যাক্সন্, ডেন্, ও নর্ম্মানদের মধ্যে থেকে হয়েছে, ইটালীয়ানদেরও তেম্নি রোমান্, টিউটন্, ইট্রস্কান্ গ্রীক ও আরবদের থেকে উৎপত্তি। এই সমষ্টি দু'দিনের জন্য প্রকাশ পেলে তা' জাতি বলে গণ্য হবে না—তার স্থায়িত্ব লাভ করা দরকার। কিন্তু যে কোনও স্থায়ী গণ-সমাজকেই জাতি বলা হয় না, গণ-সমষ্টিকে একটি ভূখণ্ডে বসবাস করতে হবে। জাতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল, জাতির মধ্যে এক ভাষার প্রচলন, বিশিষ্ট অর্থ-নৈতিক সমাজব্যবস্থা। এই সঙ্গে থাকা চাই জাতীয় চরিত্র বা ইংরাজীতে যাকে বলা হয় psychological make-up। এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের যখন সংযোগ হয় তখনই আমরা একটি জাতি পাই। এর যে কোনও একটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই জাতি সৃষ্টি হয় না। হিট্‌লার যখন বলে যে নর্ডিক আর্য্যগণই শুধু জার্ম্মান জাতি বলে গণ্য হবে, তখন সে ভুলে যায় যে নর্ডিক আর্য্যরা ছাড়াও জার্ম্মান জাতির মধ্যে অন্য অনেক ধারা আছে। তা ছাড়া, যদি নর্ডিক আর্য্য পুত্র মাত্রেই জার্ম্মান জাতি বলে গণ্য হ'ত, তাহলে ত বল্‌টিক সাগরের উপকূলে সকলকেই জার্ম্মান বলে ধরা উচিত, সুইডরাও তাহলে জার্ম্মান। গত মহাযুদ্ধের আগে অষ্ট্রিয়া কিম্বা রাশিয়া এক একটি স্থায়ী গণ-সমষ্টি ছিল, কিন্তু তাদের একটি জাতি বলে ধরলে ভুল হবে। তাদের মধ্যে এক ভাষার আধিপত্য ছিল না। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে চেক্ জাতি ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পোল জাতি বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু শুধু এক ভাষাই জাতির বৈশিষ্ট্য নয়—তাহলে ত ইংরাজ ও আইরিশ, নরওয়েজিয়ান ও ডেনরা এক জাতি বলে পরিচিত হত। অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থাও একরকম হলেই জাতি না হতেও পারে। ইংরাজ ও আমেরিকানরা একই ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু তারা ত এক জাতি বলে গণ্য হয় না। তাই, এই সবকটা বৈশিষ্ট্য একত্রে প্রকাশ না পেলে জাতির সৃষ্টি হয় না।

কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ও জাতীয়তাবোধের আরম্ভ ইতিহাসের যে-কোনও পর্ব্বে সম্ভব নয়। সমাজের ক্রমবিকাশের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়ে জাতীয়তার সূচনা হয়। য়ুরোপের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার সুরু। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী ইত্যাদি দেশে এই ধারাই ফুটে উঠেছে। ফিউডাল যুগে জাতীয়তাবোধ মোটেই ছিল না। ফিউডাল সমাজের বিভাগ স্তরে স্তরে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে নয়। ইংলণ্ডের ফিউডাল রাজা এক সময় ফ্রান্সের অর্দ্ধেক ভূখণ্ডের উপর জমিদারী করত। ক্রুশেডের সময় সব দেশের ফিউডাল শাসকশ্রেণী একত্র হয়ে যুদ্ধ করে। তখন জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ছিল না, কারণ ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থায় জাতীয় পার্থক্যের কোনও স্থান ছিল না।

তারপর, ক্রমে ফিউডাল ব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা-বোধের আরম্ভ হল। ইংলণ্ডে টিউডর রাজাদের আমলে তার সূত্রপাত। বাণিজ্যের প্রসারতালাভে ফিউডাল প্রথা অনেকটা খর্ব্ব হয়ে গিয়েছিল। ফিউডাল শাসকশ্রেণীদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ—Wars of the Roses—তাহাদের ধ্বংস করে; টিউডর রাজারা নতুন বণিকশ্রেণীর সাহায্য নিয়ে নতুন রকমের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। এলিজাবেথের সময় আমরা যে জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ দেখতে পাই কৃষ্টি, রাজনীতি, ধর্ম্মে, সমাজে—তার পেছনে ছিল এই বণিকসম্প্রদায়ের উত্থান। সপ্তদশ শতাব্দীতে ষ্টুয়ার্ট রাজা ও পার্লামেন্টের যে বিরোধ চলে তারও মূল কারণ এই বণিকসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা। শেষে যখন তাদের জয় হল তখন ইংলণ্ডে শুধু ফিউডালিজমের ধ্বংস হল না, জাতীয় জাগরণ, জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হল। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় জাগরণ, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় ঐক্য এ সবই ফিউডাল যুগের পর ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

ফ্রান্সের ইতিহাসেও একই ব্যাপার দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন ফিউডাল প্রথার ধ্বংস হল, ঠিক তখনই ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য, জাতীয়তাবোধের বিকাশ দেখা যায়। য়ুরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত শক্তির বিপক্ষে ফরাসী জাতি নব জাগরণের উদ্দীপনায়

অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করল। শুধু তাই নয়, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অধীনে ফরাসী জাতীয়বাহিনী সমস্ত য়ুরোপ জয় করে ফিউডাল প্রথার উচ্ছেদ সাধন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে দিল। তাই নেপোলিয়নের আধিপত্য থেকেই জার্ম্মান ও ইটালীয় জাতীয়তাবোধের সূচনা। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দলও ছিল, কিন্তু তার পরাজয়ে ধনতন্ত্রেরই জয়লাভ হল। য়ুরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নকে তাই একাধারে জাতীয়তাবোধের পুরোহিত ও বুর্জ্জোয়া ধনতন্ত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে গণ্য করা উচিত।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনেও এই ধনতন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। সেখানকার নতুন বুর্জ্জোয়া শ্রেণী ইংলণ্ডের বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ঘা দিতে, বিরোধের সৃষ্টি হল—এবং তা ক্রমে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হল। পূর্ব্ব এসিয়াতে জাপানের ইতিহাসেও সেই কথা লেখা। ফিউডাল প্রথার বিনাশ করেই জাতীয়তার নিশান উড়িয়ে বুর্জ্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা পেল, এখানে বিপ্লবের সৃষ্টি হয় নি বটে, কারণ পুরোন ফিউডাল জমিদাররাই অনেকে বুর্জ্জোয়া বেশে অবতরণ করলেন। তাই জাপানে ফিউডাল ও বুর্জ্জোয়া দুই রকমের শ্রেণীগত শোষণ আজকেও চলছে।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে একটা কথা প্রতিপন্ন হচ্ছে যে ধনতন্ত্রের প্রতিপত্তির সঙ্গেই জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্য দেখা দেয়। ফিউডাল যুগে তা' সম্ভব নয় এবং দরকারও হয় না। তাই জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্য ও চেষ্টা প্রধানত বুর্জ্জোয়াদের শ্রেণীগত সাধনা। ফিউডাল প্রথার বাধা-বিঘ্ন ভেঙ্গে ফেলে ধনতন্ত্রের অবাধ, অপ্রতিহত গতি তারা চায় এবং জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তা' লাভ করে। অবশ্য, ফিউডাল অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়াদের সহায়ক হিসাবে শ্রমিক ও কৃষকরা যুদ্ধ করে। কিন্তু, সেই বিপ্লবের কর্ণধার বুর্জ্জোয়া, তার লক্ষ্য ধনতন্ত্রের প্রসার, তার আদর্শ জাতীয়তাবাদ।

৩

এ' পর্য্যন্ত আমরা যে কটি জাতির ইতিহাস দেখলাম, তার প্রত্যেকটিতে এক একটি কেন্দ্রভূত রাষ্ট্রের (centralised state) সৃষ্টি হয়েছে।

ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে এক একটি জাতি জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তার ফলে এক-জাতি-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের (mono-national state) উদ্ভব হয়। কিন্তু এরকম অবস্থা সব দেশে দেখা দেয় নি। পূর্ব্ব য়ুরোপে ফিউডাল সামন্ততন্ত্র ভাঙবার পূর্ব্বেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—কারণ, সেখানে বাইরের তুর্কী, মঙ্গোল প্রভৃতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কড়া ব্যবস্থার দরকার পড়ে এবং তা' শুধু কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রেই সম্ভব। তাই রাষ্ট্রের বিকাশ ধনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পূর্ব্বে হ'ল, এবং ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের বদলে বহু-জাতি-মিলিত (multi-national) এক নতুন ধরণের রাষ্ট্র দেখা দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধারা আমরা দেখতে পাই। দিল্লীর বাদশাহী আমলে যে শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তা' ধনতন্ত্রের উপর নির্ভর করত না মধ্য এসিয়া থেকে প্রবল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র সম্বল ছিল পরাক্রমশালী সৈন্যবাহিনী এবং তা' শুধু সংগঠিত রাষ্ট্রে সম্ভব। ভারতেও তাই ফিউডাল যুগ শেষ হবার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রিক ঐক্য প্রকাশ পায়।

আর একটি বিশেষ কারণে আমাদের দেশে ফিউডাল যুগের অবসানের পূর্ব্বেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ফিউডাল প্রথার কৃষিকর্ম্ম মানুষের একমাত্র উপজীব্য ছিল। য়ুরোপে কৃষিকর্ম্মের জন্য অনায়াসেই জল পাওয়া যেত, কিন্তু, গ্রীষ্মপ্রধান এসিয়ার দেশগুলিতে জলসেচনের প্রয়োজন হ'ল। জলসেচন প্রণালী খুব উন্নতিলাভ করে। এসব কাজ ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবপর হয় না, সামন্তশ্রেণীর উপর প্রজাদের নির্ভর করতে হয়। তাই কৃষি-কার্য্যের বৈশিষ্টতার ফলে আমাদের দেশে সামন্ত-শাসকশ্রেণীর একাধিপত্য দৃঢ় হয়। এই কারণে রাষ্ট্রগঠন কার্য্য ফিউডাল যুগেই এখানে আরম্ভ হয়। দিল্লীর সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের গতিরোধ করে বটে, কিন্তু, রাষ্ট্রের সবকিছু ব্যবস্থা সেখানে দেখা দেয়। সামন্ত-শাসকশ্রেণীর এরকম অত্যধিক ক্ষমতালাভের ফলে বণিক বা বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর প্রতিপত্তি বদ্ধ থাকে। ধনতন্ত্রের প্রসার বদ্ধ থাকতে ভারতের জাতীয় ঐক্যের রূপ য়ুরোপ থেকে বিভিন্ন হয়। রাষ্ট্রীয় ঐক্য দেখা দেয় বটে, কিন্তু জাতীয় ঐক্য নয়। আজকে আমাদের জাতীয়তাবাদীরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে যে জাতীয় ঐক্যের নমুনা দেখান

তা' এই রাষ্ট্রিয ঐক্য এবং তার সংলগ্ন বৈশিষ্ট্যগুলি। সারা ভারত জুড়ে জাতীয ঐক্য ধনতন্ত্রের অভাবে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা দেয নি। পূর্ব্ব যুরোপের মত এখানেও বহু জাতির সম্মিলিত প্রকাশ রাষ্ট্রে পাওয়া যায। এক একটি জাতি এক একটি বিভিন্ন রাষ্ট্র গড়তে সক্ষম হয নি উপরোক্ত দুই কারণে। ফিউডাল প্রথার দীর্ঘায়ু অবশ্যম্ভাবী ছিল, এবং সেই কারণেই বিভিন্ন জাতিগুলির প্রকাশ ব্যাহত হয।

এই সব বহু জাতি মিলিত রাষ্ট্রগুলিতে ধনতন্ত্রের প্রবেশ এক নতুন সমস্যার সূচনা করে। জাতিগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় ত অন্যগুলির উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং ধনতন্ত্রের প্রভাবে সেই সব জাতির বুর্জ্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে অন্য সব অনুন্নত জাতিগুলির উপর অত্যাচার চলে। পুরোন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের মধ্যে অষ্ট্রিয়ানরা এ'ভাবে অন্যান্য জাতিগুলির উপর অত্যাচার চালায। রাশিয়ার সাম্রাজ্য রুশ বুর্জ্জোয়ারা মধ্য এশিয়ার অনুন্নত জাতিগুলিকে পদানত করে রেখেছিল। কোনও কোনও দেশে অত্যাচারটা আসে বাইরে থেকে। বাইরে থেকে বর্দ্ধিষ্ণু কোনও এক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনুন্নত রাষ্ট্রটিকে আক্রমণ ক'রে সেটিকে দাসদেশে পরিণত করে। কোথাও বা দাসদেশটি একেবারে সাম্রাজ্যতন্ত্রের পরাধীন হয যেমন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে, কোথাও বা অর্থনৈতিক প্রভাব দিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করে যেমন চীনদেশে ইংরেজ, আমেরিকান, জাপান, এমনকি জার্ম্মানীও বাণিজ্যের সুবিধা নিয়ে দাসদেশের সৃষ্টি করে।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের এই বিস্তারের যুগে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ফিউডাল রাষ্ট্রগুলি ক্রমে দাসদেশে পরিণত হয। কিম্বা তাদের মধ্যের এক জাতি অন্য জাতিগুলিকে অত্যাচার করে। অন্যদিকে, পুরোন এক-জাতি-বিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রের পথে অনেকটা এগিয়ে যাওয়াতে তার বুর্জ্জোয়া-শ্রেণী সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয এবং একই সাম্রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ধনতান্ত্রিক, স্বচ্ছল একটি জাতীয় রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে কতকগুলি দাসদেশ অনুন্নত অবস্থার বিদ্যমান। এক কথায়, তাদের এক-জাতি বৈশিষ্ট্যটা নষ্ট হয়ে গেল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বহু-জাতি-রাষ্ট্রে

, পরিণতি লাভ করে। দাসদেশগুলিতে তাহলে বিভিন্ন জাতি একই রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে পড়ে অনেকটা একভাবে থাকে। তার মধ্যে কোনও একটি অন্যটিকে সহজে পরাহত করতে পারে না। পার্থক্য ও ব্যষ্টিগত বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গেই তাদের আসল সংগ্রাম। এই সব দাসদেশেও যে ধনতন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়, তা' জানা দরকার। সাম্রাজ্যতন্ত্র নানা রকম আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা, যথা রেলগাড়ী, আনতে গিয়ে আধুনিক শিল্পের গোড়াপত্তন ফেলে—এবং ক্রমে তাই থেকে এক দেশীয়-বুর্জোয়াশ্রেণী আরম্ভ হয়।

দাসদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্দেশ্য হবে সম্মিলিত রাষ্ট্রটির ঐক্য গড়ে তোলা। বিভিন্ন জাতির আপন সংস্কৃতি বা স্বার্থ তারা মানতে চায় না— তারা চায় তাদের আধিপত্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় থাকবে। তাহলে সাম্রাজ্যতন্ত্রকে জোর করে, জাতীয় আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে, সুযোগ সুবিধা জোগাড় করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জোড়া আধিপত্যের মধ্যে আপন শিল্প ও ব্যবসায় মুনাফা বজায় রাখতে পারবে। তাই তারা বিভিন্ন জাতির জাতীয়তা বাদ দিয়ে এক দেশব্যাপী ঐক্যবাদ প্রচার করে। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনে এর পরিচয় পাই। সাম্রাজ্যতন্ত্র আপন স্বার্থের জন্য এখানে ধনতন্ত্র সুরু করে। ফলে এখানে এক বুর্জোয়া-শ্রেণী তৈয়ারী হয়। আজ তারা "জাতীয় ঐক্যের" নামে আপন স্বার্থরক্ষা করছে। বাইরে জাতীয় ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্রকে ভয় দেখাবার চেষ্টা, দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের নামে মুনফার বাজার বজায় রাখা।

৪

আমরা দেখতে পাই যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগে জাতীয় ঐক্য এক নতুন রূপ ধারণ করে। ক্রমে নতুন নতুন সমস্যার উদয় হয়। প্রথমেই দেখতে হবে নির্য্যাতিত জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের ধারা। বহু-জাতি-মিলিত রাষ্ট্রে যখন একটি জাতি অন্যগুলির উপর প্রভুত্ব করে, তখন অন্যগুলি আপন জাতীয়তার জন্য যুদ্ধ করে। বাইরে থেকে দেখলে হয় ত মনে হবে যে এসব জাতীয় সংগ্রাম প্রগতিপন্থী। কারণ অন্য জাতির কবল থেকে মুক্তির জন্য এর

চেষ্টা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চেকরা যদিও অষ্ট্রোহাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবু তাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী হিসাবেই দেখতে হবে, কারণ, তারা তখন রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করেছিল, এবং রাশিয়ার সহায়ক হিসাবে যুদ্ধ করে। অপর পক্ষে, চেকদের উপর অষ্ট্রিয়ার শাসকশ্রেণীর অত্যাচারকেও সমর্থন করা চলে না। প্যালেষ্টাইনে আরবদের যে সংগ্রাম তা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র থেকে জাতীয় মুক্তিলাভের সংগ্রাম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু, ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যতন্ত্রের সাহায্য যখন আরব জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করে, তখন তাদের মুক্তি-সংগ্রামের দাম কমে যায়। ইরাণে রেজাশাহ ঠিক সেইভাবে তরুণ জাতীয়তাবাদকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তার ধ্বংস সৃষ্টি করল।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে কোনও জাতীয় আন্দোলনের এই এক বিপদের দিক। গতযুদ্ধে অনেকে বিশ্বাস করত যে জার্ম্মানীর সাহায্য নিয়ে আমাদের দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে। কিন্তু, জার্ম্মান সাম্রাজ্যতন্ত্র যে প্রথমেই তা' থেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধি দেখবে এবং দরকার হ'লে যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে নষ্ট করে দিতে পারে, সে কথা অনেকে ভুলে যান। মুসোলিনী অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমে প্রাচ্যের জাতীয় আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করেছে, কিন্তু, আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় যখন এশিয়ার প্রগতি আন্দোলনগুলি ফাসিষ্টদের নিন্দা করে, তখন থেকে মুসোলিনীর প্রাচ্য প্রীতি বন্ধ হয়েছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদও এই পন্থা অবলম্বন করে এসিয়ার নব জাগরণের নেতৃত্ব দাবী করে। আমাদের দেশে অনেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধবাদী হ'য়ে জাপানীদের প্রশংসা করে থাকেন। কপট বন্ধুর বেশে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদ যাতে জাতীয়তাবাদকে বিভ্রান্ত না করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

জাতীয় নেতৃত্ব যখন বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকে, তখন তারা যে নিজের স্বার্থে তা' ব্যবহার করবার চেষ্টা করবে এ' কথাটি আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু, তার ফলে অন্যান্য পর্য্যাস্ত জাতিগুলির কি অবস্থা হবে? তাদের কি বিকশিত হবার কোনও সুযোগ নেই? এই সব প্রশ্নের মীমাংসা আজ আমাদের দেশেও

করতে হবে। বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন বিভিন্ন জাতিগুলির অস্তিত্ব খর্ব্ব করতে চেষ্টাবান হয়, তখন দেখতে হবে তার উদ্দেশ্য কী। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে তার দুটো উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্যতন্ত্রের সামনে ঐক্যের শক্তি দেখিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামে যে গণঐক্যের প্রয়োজন তা' কেউ আপত্তি করবে না, বরং ঐক্য যতই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দেখা দেবে, ততই মুক্তির দিন এগিয়ে আসবে। বুর্জোয়ার ঐক্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল—আপন মুনাফার বাজার অপ্রতিহত রাখার প্রয়াস, এবং সংশ্লিষ্ট জাতিগুলিতে ধনতন্ত্রের প্রসার বন্ধ রেখে মুনাফা হাতের মুঠোয় আটকিয়ে রাখার চেষ্টা। এখানে আমাদের দেখতে হবে যে বিভিন্ন জাতিগুলির আর্থিক উন্নতির পথে যদি এই জাতীয় ঐক্যের নামে ব্যাঘাত করা হয়, তাহলে সেরকম জাতীয়তাবাদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে।

বুর্জোয়া জাতীয় নেতৃত্বের প্রচেষ্টায় শুধু আর্থিক উন্নতির ব্যাঘাত নয়, জাতীয়তার সমস্ত চিহ্নই লোপ পেতে পারে। কিন্তু, জাতীয়তাবাদের বাইরের আবরণে দোষের কিছুই নেই। জাতীয় ঐক্যের নামে যদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলিকে নষ্ট করা হয়, তাহলে সেই জাতীয় ঐক্যের কোনও মূল্য নেই। একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্যের অভাবে আন্দোলনে বিভক্ত হবার ভয় আছে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐক্যের নামে অন্য জাতিগুলিকে খর্ব্ব করবার চেষ্টা ব্যর্থ করা উচিত। এই মাপকাঠি দিয়েই আমাদের পাকিস্থান ও অন্যান্য প্রাদেশিক অনৈক্যের ধারাকে দেখতে হবে। শুধু ধর্ম্মের নামে জাতীয়তা হয় না, তা' ত আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু, ভারতবর্ষে এমন অনেক জাতি আছে, যার পূর্ণবিকাশ এখন পর্য্যন্ত যদিও হয় নি, তবু সেগুলিকে আগামী দিনে পুরোদস্তুর জাতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। সেইসব জাতীয় সমষ্টিগুলি আপন সংস্কৃতি ও রীতি এমন কি ভাষা ও সাহিত্য, আর্থিক অবস্থা সবকিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি, গুজরাটি বা পাঞ্জাবের সংস্কৃতি বিভিন্ন রকমের। তার প্রত্যেকটির প্রকাশলাভের সুযোগ দিতে হবে। সেই অনুসারে আগামীকালের সমাজব্যবস্থায় তার সংস্থান থাকা অতিমাত্র আবশ্যক।

কিন্তু, পৃথক পৃথক জাতীয় আন্দোলন কখনও দাঁড়াতে পারবে না আপন শক্তিতে। তাই একত্রীভূত হয়ে জাতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর নতুন সমাজে প্রত্যেক অপরিণত জাতীয়তাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে। পাকিস্থানের দাবীর বিপক্ষে শুধু জাতীয় ঐক্যের স্লোগান তুলিলে চলবে না। দেখাতে হবে, পাকিস্থান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের যে ভাগ হচ্ছে, তা' বৈজ্ঞানিক বিচারে জাতিগুলির অস্তিত্ব ও অবস্থিতির সঙ্গে মিলছে কিনা। যেখানে সেরকম জাতি দেখা যাচ্ছে, সেখানেই আশ্বাস দিতে হবে যে স্বাধীন ভাবতে তাদের দাবী গ্রহণ করা হবে। তাই, জাতীয়তাবাদের নামেই ভারতকে বিভক্ত করতে হতে পারে। কিন্তু, সে বিভাগ আজ হবে না। মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় শক্তি বিভক্ত করা যায় না। জয়লাভের পর নতুন ব্যবস্থা হবে, নতুন জাতিগুলির উত্থান সংস্থাপন করতে হবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ম্যাজিক

বাসেশ্বরী বেরিয়ে আসতেই সদাশিব বাথরুমে ঢুকলো। এবং বাথরুম থেকে বেরিয়েই সরাসরি বাসেশ্বরীর কাছে এসেই উপস্থিত।

'এই নাও, টাকা নাও একটা। হাত পাতো।'

বাসেশ্বরী তখন নতুন করে চুল ঝাড়ছে। হেলা কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে সদাশিবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। টাকা কেন? সে কী কথা।

'এটা কী? টাকা তো?' সদাশিব তার চোখের সামনে একটা চকচকে টাকা নাচাতে লাগলো। 'তবে নিচ্ছ না কেন? নাও. টাকার অমান্য করতে নেই, এলেই হাত পেতে নিতে হয় তক্ষুনি। হাত পাতো বলছি।'

বাসেশ্বরী তবু দ্বিধা করছিলো। সদ্য-সদ্য বাড়ি ফিরেই সদাশিব তাকে এ টাকাটা কেন দিচ্ছে, কিসের বাবদ, সে বুঝতে পাচ্ছিলো না কিছুতেই।

'হাত পেতে নে না টাকাটা। বলছে এত করে।' ও পার থেকে বিছানায়-শোয়া অনুপমা বলে উঠলো দুর্বল, নির্বাপিত কণ্ঠে।

কিছুটা সাহস পেলো বাসেশ্বরী। তবু হাত বাড়িয়ে, অকারণে, পুরুষের হাত থেকে টাকা নিতে কেমন লজ্জা করে।

'দিন যখন দেবেন।' ঠোঁট টিপে হেসে বাসেশ্বরী হাত পাতলো।

বেশ মজবুত হাত। থাবাটা প্রকাণ্ড। আঙুলগুলো মোটা-মোটা।

'কী, এটা টাকা তো ঠিক? ঠিক বাজছে শুনছ?' দু' আঙুলে রেখে সদাশিব টাকাটা বাসেশ্বরীর চোখের সামনে শূন্যে তুলে বাজালো দুবার। বললে, 'এইবার নাও, ধরো।' বলে টাকা-শুদ্ধু তার হাতটা সে বাসেশ্বরীর প্রসারিত করতলের উপর উপুড় করে ধরলো। একটু-বা ত্রস্ত, ত্বরিত গলায় বললে, 'শক্ত করে মুঠ করে ধরো টাকাটা। বড়ো পাজি জিনিস, আঁকড়ে আঁট করে ধরে থাকতে হয়।'

রাসেশ্বরী হতভম্বের মতো হাত মুঠ করলে।

'এবার দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।' বললে সদাশিব, একটু-বা যেন তাগাদার সুরে।

'এ আবার কোন ঢঙ্। কে চেয়েছিলো আপনার টাকা?' হাতটা ঈষৎ লম্বা করে সদাশিবের দিকে ছুঁড়ে দিল রাসেশ্বরী। কিন্তু কী সর্বনাশ, তার মুঠোর মধ্যে সেই টাকা নেই, গোল-গোল ছোট-ছোট দুটি সোনার বিন্দু, তারই কান-ফুল।

'ও মা, বাথরুমে ফেলে এসেছিলুম বুঝি।' বাঁ হাত দিয়ে রাসেশ্বরী কর্ণমূলদুটি অনুভব করলে। চারদিকে ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে বললে, 'কী আশ্চর্য, এ আমার হাতের মধ্যে চলে এলো কি করে? টাকাটাই বা গেল কোথায়? আপনি নিয়ে গিয়েছেন বুঝি?'

'ছেলে-ভুলুলে চলবে না।' সদাশিব গম্ভীর গলায় বললে, 'আমার টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও।'

দিদির মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি দেখে রাসেশ্বরী কিছুটা আশ্বস্ত হলো। বললে, 'সব আপনার চালাকি। আমি বুঝি বুঝি না কিছুই।' বলে সে একটা ঘনকৃষ্ণ কটাক্ষ করলো।

আর যাই হোক, তার এই ভঙ্গিটাও বিশেষ বোধগম্য নয়। তাই অনুপমা বললে, 'ম্যাজিক লো ম্যাজিক। ভোজবাজি।'

ভর-দুপুর, খেয়ে-দেয়ে রাসেশ্বরী অনুপমার পাশটিতে এসে বসেছে। দিদির কথামতো নিয়ে বসেছে সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পড়ে শোনাচ্ছে লক্ষ্মণের শক্তিশেল। এমন সময় পাশের ঘর থেকে শোয়া ছেড়ে উঠে এলো সদাশিব, অনুপমার তক্তপোষের কাছেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বললে, 'শুনি তোমার পড়া—'

রাসেশ্বরীর লজ্জা পাবার কথা, কিন্তু ভয় পেয়ে সে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলো আচমকা।

'কী হলো, কী হলো তোমার?' সদাশিব চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করলে।

গায়ের এলোমেলো আঁচলের দিকে চেয়ে ভীত মুখে রাসেশ্বরী বললে, 'নেংটি ইঁদুর একটা—'

'কোথায ?'

'তক্তপোষেব তলা থেকে আমাব গাযেব উপব লাফিয়ে পড়লো দেখলাম। এই যে, এই যে।' ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে বাসেশ্ববী কাপড ঝাডতে লাগলো. 'কী সর্বনাশ। বুকেব মধ্যে ঢুকে পডলো যে।' দিদি তো বোগে অনড, তাব কাছে কিছুই সাহায্যেব আশা নেই ভেবে বাসেশ্ববী সদাশিবের দিকে তাকালো একেবাবে দীনহীনেব মতো। কোথায় বা তাব গায়েব বসন, কোথায বা তাব কটিব বসন—অশাসন সর্বত্র।

'ইঁদুব—ইঁদুব এখানে আসবে কোত্থেকে ?' সদাশিব চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

না, নেই, গেছে—তাই মনে হলো বাসেশ্ববীব। সেমিজেব উপব পুরু কবে আঁচল টেনে শান্ত ভঙ্গিতে বসতে যাবে সে বিছানায়, অমনি আবাব চোখ বড়ো কবে চেঁচিয়ে উঠলো 'ঐ যে, ঐ যে আবাব। দিদিব গাযেব উপব।'

অনুপমাব অবিশ্যি কোন চাঞ্চল্য নেই। মুখে অতি-ম্লান একটু হাসি ছাড়া।

ইঁদুবটা আবাব অদৃশ্য হযে গেছে। কিন্তু বাসেশ্ববীব স্বস্তি কোথায। এঁটে-সেঁটে বসেও তাব কেমন ভয এই বুঝি ফেব সব অগোছাল, উথল-পাথল হযে যাবে।

'আমাব বসা হবে না এ-ঘবে। ঐ—ঐ চলে গেল ফেব পাযেব তলা দিযে।'

'না, না, বোসো। ভয় কী। ইঁদুব আমাব এই হাতের উপব।' সদাশিব মেলে ধবলো তাব হাতেব তালু, তাব উপবে বসে স্প্রিং-বসানো একটা ন্যাকড়াব ইঁদুব ফুবফুব কবে ল্যাজ নাড়ছে।

'ম্যাজিক লো ম্যাজিক।' জড়ানো ক্ষীণকণ্ঠে বললে আবাব অনুপমা। 'দেখছিস না ইঁদুবেব পাযেব সঙ্গে সুতো বাঁধা, আব সেই সুতো রযেছে ওব আঙুলে জড়ানো।'

ঠাহব কবে দেখবাব জন্যে বাসেশ্ববী ঝুঁকে এলো একটু সদাশিবেব হাতেব কাছে, আব অমনি সেই ইঁদুব তাব পিঠেব উপব লাফিযে পড়েই ঘবময মাতামাতি সুরু কবে দিল। বাসেশ্ববীব আব ভয নেই, বেধড়ক হাসতে লাগলো সে শব্দ কবে।

যেন নতুন কিছু শুনছে আজ সদাশিব। দেহের স্তবকে-স্তবকে হাসি, শাড়ির পরতে-পরতে। ন্যাকড়ার আগুনের মতো নিবেও নিবতে চায় না।

উত্তর বঙ্গের সফর সেরে বাড়ি ফিরে এই দেখতে পেলো সে রাসেশ্বরীকে। তার আগে ছিল শুধু সে একটা শোনা-কথা। অনুপমার দূর সম্পর্কের দুঃস্থ এক বোন, স্বামী যার দশ বছর ঘরছাড়া। দেশে-গাঁয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, চেয়ে-চিন্তে কোনোরকমে দিন চালায়। চেহারা যেটা ভেসে উঠেছিলো চোখের সামনে সেটা নিতান্তই হাজাশুখা, গরলাযেক পতিত জমির চেহারা। এমন ভরা-ভর্তি ভাদ্রের নদীর নয়। জলের দিকে যাওয়া ঠিক হলো না, রাসেশ্বরী একেবারে দপদপে আগুনের থাপরা।

সাত মাসেরো উপর অনুপমা শোয়া। স্নানের ঘরে টলে পড়ে গিয়ে বাঁ পাশ তার অবশ হয়ে যায়। গোড়ায় কথাও জড়িয়ে গিয়েছিলো, ঠিকঠাক কিছু মনে করতেও পারতো না। আস্তে-আস্তে, ঝাপসা-ঝাপসা, সব আবার ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু বা দিক তার আর বশে এলো না। কেউ-কেউ বলে, কথা ও স্মৃতির যেটুকু স্ফুরণ, সেটা শুধু নির্বাপিত হবার আগে প্রদীপের চতুরালি।

কুড়িগ্রাম গিয়েছিলো সদাশিব এক পুলিশ-ইনস্পেকটরের ফেয়ার-ওয়েল পার্টিতে ম্যাজিক দেখাতে। আর কোথাও কজি জোগাড় হয় কিনা তাই ভেবে সে এখানে-ওখানে ঢুঁ মেরে বেরিয়েছে। মোটমাট বাইরে ছিল সে দিন কুড়িরও বেশি। বাড়ি থেকে চিঠি যেত বড়ো ছেলের হাতে—মা একই প্রকার আছেন, চিন্তা করবেন না। বেবদল, একই প্রকার থাকাটাই যে জাদুকরের কাছে ঘোরতর চিন্তার কথা ছোট ছেলে তার কী বুঝবে?

বাড়ি ফিরেই এই কাণ্ড। এই রাসেশ্বরী।

একাদিক্রমে সতেরোটা ঝি ছিল এ পর্যন্ত, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে অনুপমা। কোথাও যেন সে এমন স্পর্শটি পায় না যা নরম আর গরম

একসঙ্গে। কী মনে করে কত দিনের ছাড়াছাড়ি এড়িয়ে চিঠি লেখালে সে রাসেশ্বরীকে। অশ্লেষা দিকশূল না দেখে রাসেশ্বরী এক দৌড়ে এসে হাজির হলো।

না খেতে পেয়ে আঁত মরে গিয়ে পেটের চামড়া পিঠে এসে ঠেকেছে—এমনি দেখবে ভেবেছিলো রাসেশ্বরীকে। কিন্তু রাসেশ্বরীর সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য যেন ধরে না। থোলো-থোলো স্বাস্থ্য নয়, ছেঁচা মজবুত চেহারা। আর কী শক্তি ধরে সে শরীরে, কাঠের উনুনের মুখে তার এক ফুঁয়েই আগুন জ্বলে ওঠে, জলে ধুয়ে কাপড় একবার নিংড়ে দিলেই শুকিয়ে যায় দেখতে-দেখতে, রোদ লাগে না। কাঁসার বাসন মাজলে রূপার হয়, পিতলের মাজলে সোনার। ঘর ঝাঁট দিলে মনে হয় যেন শ্বেতপাথরের মেঝে। অরুণোদয়ে ওঠে আর অস্ত যায় মধ্যরাত্রে। হাম-হাম করে থাবা-থাবা খায় আর গা ঢেলে দিয়ে ঘুমোয়।

আর, যখন, কখনো-সখনো পাশটিতে এসে বসে, অনুপমা তার গায়ের উমে বড়ো আরাম পায়, ভাবে, এই বুঝি সেও আবার ডেউয়ে' উঠবে। দিয়ে উঠবে পাখার ঝাপটা।

যাক, ছেলেপিলেগুলোর তবু একটু যত্ন হচ্ছে, ঝি-মাগীদের ঠেকার আর সইতে হচ্ছে না, সাশ্রয় হচ্ছে সংসারের, নিজের অসহায়তায় অসঙ্কোচ হতে পারছে কতকটা, আর সদাশিবেরো যেন মনের গুমোট গিয়েছে কেটে।

'ধুমসো জোয়ান।' কী-একটা ভারী কাজ করছিলো রাসেশ্বরী, স্বামীকে শুনিয়ে অনুপমা বললে।

'কিন্তু দেখেছ, কেমন গড়ন-পিটন, কেমনই বা হেলন-দোলন।' সদাশিব একটু নির্লজ্জের মতো বললে।

এখন তার অনেক সাহস, ভাবলো অনুপমা। ভাবলো, সেই শুধু আউট হয়ে গেছে।

দুপুরবেলা। অনুপমাকে তরণীসেন-বধ পড়িয়ে শোনাচ্ছিলো রাসেশ্বরী, সদাশিব এলো তাসের ম্যাজিক দেখাতে।

রাসেশ্বরী তাসের ভাঁজ থেকে বেছে-বেছে চারটে বিবি বের করে নিল। সদাশিব বললে, 'উপুড় করে রেখে দাও শুইয়ে।'

পাশাপাশি রেখে দিল উপুড় করে। সদাশিব বললে, 'এবার তুলে দেখ তো, কী করছে ওরা চার বোন।'

রাসেশ্বরী তো অবাক। চারখানা তাসের মধ্যে দুটো শুধু বিবি, আর দুটো সাহেব জুটেছে কোত্থেকে।

'হতেই হবে।' হাসতে-হাসতে বললে সদাশিব, 'একা-একা ওরা থাকে কি করে?'

রাসেশ্বরী আকুলি-ব্যাকুলি করে উঠলো 'আমাকে শিখিয়ে দিন না। ধরলেন না, ছুঁলেন না, বিবি বদলে সাহেব হয়ে গেল—দিন, দিন না আমাকে শিখিয়ে।'

বাইরে অমনি দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

সেদিকে চলে যেতে-যেতে ব্যস্ত হয়ে সদাশিব বললে, 'এটা কী ছাই খেলা! দাঁড়াও, রোসো—'

দরজার কড়া নাড়ছিলো অটলবিহারী, আদালতের পেয়াদা। সদাশিবের নামে সমন নিয়ে এসেছে।

'দুই নম্বর ছোট আদালত করেছে, বাবু।'

'দুই নম্বর?' সদাশিব যেন হোঁচট খেল।

'হ্যাঁ। এক, কালী ডাক্তার, দুই আপনার বাড়িওলা।'

'কালী ডাক্তারের বিলের টাকা শুধতে পারিনি বটে, কিন্তু তাই বলে ও নালিশ করলো?' সদাশিব চোখে ঝাপসা দেখছে।

'ওটার কথা আর বলবেন না, বাবু। ওটা হচ্ছে বোম্বাই বজ্জাত।' অটলবিহারী মুখে একটা ঘৃণার ভাব আনলো। বললে, 'কারুর খারাপ অসুখ করলে প্রথমটা খুব ধমকায়, পরে রাষ্ট্র করে বেড়ায় চারদিকে। তা, আপনি ভাববেন না, বাবু—'

'আর, ও ধরবে কী আমার অস্থাবর করে? আমার আছে কী ধরবার? আর, বাড়িওলা বুঝি আমাকে উচ্ছেদ করতে চায়?' সদাশিব একটু হাসলো। 'স্ত্রীকে নিয়ে নড়তেই যদি পারবো তবে রোন আগেই তো

পালিয়ে যেতাম তোর বাড়ি ছেড়ে, ছ'মাসের ভাড়া কখনো ফেলে রাখতাম না।'

'তা, আমাকে কিছু দিন, গরজারি করে দি সমন দুটো।' অটলবিহারী অভয় দিল।

'কত ?'

'সমন গরজারিতে আমাদের আট আনা করে। মোকদ্দমার দাবি যখন কম। একশো টাকার নিচে। একটা তেতাল্লিশ, আরেকটা বাহাত্তর। একশো টাকার উপরে হলে অবিশ্যি—'

'টাকা পাবো কোথায় ? এক টাকায় আমার পাঁচ-ছ দিন বাজার হবে।'

'কী যে বলেন আপনি বাবু।' অটলবিহারী উপেক্ষার হাসি হাসলো: 'ম্যাজিক দেখিয়ে তো আপনার ভালো রোজগার। এই তো রংপুর-দিনাজপুর ঘুরে এলেন।'

'কষ্টে-সৃষ্টে ট্রেনভাড়াটা শুধু উঠেছে। পয়সা খরচ করে কেউ দেখতে চায় না, তাই পেট চলবে কি করে বলো ? জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের সার্টিফিকেট কতগুলো জোগাড় হয়েছে শুধু।'

অটলবিহারী হাসলো। বললে, 'এ যে প্রায় আশু আচার্যির দশা আপনার। নালিশ ফসাদ করে জমি-জায়দাদ সব খুইয়েছে ও—প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি। এখন সম্বল শুধু তার কয়েকখানি কাগজ—আদালতের রায়ের নকল। তাই পুঁটলি করে বেঁধে বগলে চেপে কোর্টের বারান্দায় সে ঘুরে বেড়ায়।'

'আর কীই বা দেখাবো বলো ম্যাজিক ? সব পুরোনো, একঘেয়ে হয়ে গেছে। নিত্যি-নিত্যি নতুন রকম ম্যাজিক চাই, যা ভাবেনি কেউ, দেখেনি কেউ। নতুন-নতুন ম্যাজিকে নতুন-নতুন সরঞ্জাম লাগে, লাগে পয়সা। জোগাড় করতে পারি না।'

অটলবিহারী নরম হলো খানিকটা। বললে, 'আচ্ছা, চার আনা করেই দিন তবে। কালী ডাক্তার এক চক্কর ঘুরুক।'

'দরকার নেই। হাজির-জারিই হোক। দাও সমন, সই করে দি।' সদাশিব হাত বাড়ালো। 'নতুন কিছু একটা ঘটুক আমার অদৃষ্টে। ঘর

থেকে গাছতলায় এসে দাঁড়ানো—তাই বা কম ম্যাজিক কী। মাথার উপরে এই ছাদ আছে, আর এই সেটা আকাশ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে।'

সমন নিয়ে সদাশিব ভিতরে এলো। রাসেশ্বরী ঘরে নেই, ভিতরের দাওয়ায় বসে দিদির জন্যে শিলে অনুপান ছেঁচছে। অনুপমা যে-কে-সে শোয়া, চেয়ে আছে অথচ লক্ষ্য নেই, চোখের মধ্যে কালোর চেয়ে সাদার ভাবটাই বেশি।

কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে অনুপমা। মোটা গলায় জিগগেস করলে, 'কি, নালিশ করেছে বুঝি বাড়িওলা?'

'শুধু বাড়িওলা নয়, কালী ডাক্তারও।' বিতিকিচ্ছি করে লেখা আর্জির নকলটা দেখতে লাগলো সদাশিব।

'তুমি যখন বাড়ি ছিলে না, একদিন এসে খুব গলাবাজি করে গেছে বাড়িওলা। কিন্তু ডাক্তার— কালী ডাক্তার নালিশ করলো?'

'ভালো করতে পারলো না যখন, তখন নালিশই তো করবে। নিজের অক্ষমতার জন্যে লজ্জা নেই, উলটে আস্ফালন আছে।' হাতের কাগজ-গুলোকে দলা পাকাতে লাগলো সদাশিব।

'এদিকে কয়েক দিন আগে গঙ্গা-মুদি শাসিয়ে গেছে, উঠনো আর দেবে না আসছে-মাস থেকে। কী হবে বলো দেখি?' অনুপমার গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

'কিছু একটা হবেই।' বললে বটে সদাশিব, কিন্তু চারদিকে তার ধূমমাত্র আভাস খুঁজে পেলো না।

দিদিকে ওষুধ খাওয়াতে এসেছিলো রাসেশ্বরী, শেষের কথাটা শুনতে পেয়ে বললে, 'কী হবে? আপনার খেলা? কবে?'

সদাশিব জবাব দিল না। কেমন সহ্য হচ্ছিলো না রাসেশ্বরীকে।

তারপর রাসেশ্বরী যখন ঘাটে গেল জল আনতে, কাঁকালে কলসী নিয়ে, তার যতিপাতহীন পদপাতের দিকে সদাশিব একবার চেয়েও দেখলো না।

রাসেশ্বরী শুধু দিদির গা ঘেঁসেই বসেনি, বসেছে একেবারে তার হৃদয়ের মধ্যে। কোনো খবরই তার আর জানতে বাকি নেই, সংসারের কোনো আনাচ-কানাচই নেই আর তার অদেখা। রেলে আগে কাজ করতো সদাশিব, মাইনে যদিও কম আয় ছিল বাঁধাবাঁধি, উপরি ছিল এ-দিক ও-দিক, বছর আষ্টেক হলো ছাঁটে কাটা পড়লো সে-চাকরিটা। মফস্বলে খরচ কম, এখানেই থেকে গেল বরাবর। ছেলেবেলা থেকেই সখ ছিল ম্যাজিকের, মেতে উঠলো তাই নিয়ে। আগে ছিল সখের, পরে হলো পেশাদার।

'চাকরির তবিলে জমা ছিল না কিছু?' জিগগেস করলে রাসেশ্বরী।

'খেয়ে করে ফুরিয়ে গেছে। তারপর আমি এই পড়ে।' অনুপমা শূন্য-শুভ্র চোখে রাসেশ্বরীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ঝাপসা গলায় বললে, 'গায়ের গয়না কখানা তো কবেই গেছে, এখন চলছে ওঁর মেডেল-গুলো বেচে।'

রাসেশ্বরী অনুপমার পঙ্গু অঙ্গে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'তুমি ভেবোনা, দিদি। একটা কিছু হবেই।'

এ পর্যন্ত কিছুই তো হতে দেখলো না অনুপমা। দিনের পর দিন সেই একই রকম চেহারায় দিন আসে। একই রকম চেহারায় অন্ধকার হয়।

হঠাৎ কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছে সদাশিব। রাসেশ্বরী তার কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বললে, 'মোকদ্দমার কথা ভাবছেন বুঝি?'

'মোকদ্দমা?' সদাশিব থতমত খেল। বললে, 'কে বললে তোমাকে?'

'আমি জানি। আপনার সংস্পর্শে এসে ম্যাজিক আমিও একটু-একটু শিখেছি।' রাসেশ্বরী তরল চোখে হাসলো।

সদাশিব কিন্তু একটুও উৎসাহিত বোধ করলো না।

'কিন্তু আপনি যে ভাবছেন কেন আমি তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে ব্রহ্মাস্ত্রই তো আছে।'

'ব্রহ্মাস্ত্র?' সদাশিব সচকিত হয়ে রাসেশ্বরীর স্থিরপলক চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'কী সেটা?'

'আহা, কেন, আপনার ম্যাজিক!' রাসেশ্বরী তার ভঙ্গি আরো গম্ভীর করলো। বললে, 'খোলা টুপির মধ্যে ডিম নিয়ে আসেন একরাশ, খালি

পকেট থেকে রুমাল ওড়ান শয়ে-শয়ে, শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টি করান অনবরত —আর ডাক্তারের সামান্য বিল আর বাড়িভাড়ার কটা টাকা আপনি হাত-সাফাই করে শোধ করে দিতে পারেন না? কিসের তবে আপনার ম্যাজিক যদি এটুকু কেরামতি তার না থাকে?'

সদাশিব একদৃষ্টে রাসেশ্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটুও মনে হলো না সে ঠাট্টা করছে।

'একবার স্টেজের উপর টাকার বৃষ্টি করিয়াছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বললে সদাশিব।

'তবে?' রাসেশ্বরী চমকে উঠলে। 'একবার দেখিয়ে দিন না সেই খেলাটা। ডিম থেকে মুরগী বের করে দেন চোখের সামনে, একটা সাদা কাগজ নিয়ে দশ টাকার একখানা নোট বানিয়ে ফেলুন না এক্ষুনি। কিসের ভাবনা আপনার? আমি যদি ম্যাজিক জানতুম তো দেখতেন আমার ঘরে ভূতে টাকা বয়ে আনতো।'

সদাশিবের বুকের ভিতরটা যেন উথলে উঠলো। বললে, 'শিখবে তুমি ম্যাজিক?'

'বলছি তো কবে থেকে। দিন না শিখিয়ে।'

'শিখে তুমি করবে কী?

'দেখুন না কী করি। ভানুমতীর খেলা—অসাধ্যসাধন করবো।' রাসেশ্বরী উচ্ছল হয়ে চলে গেল।

চমৎকার হয়, যদি ম্যাজিক শেখে রাসেশ্বরী। সদাশিব প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। স্টেজের উপর রাসেশ্বরী আর সে। কত রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত খেলা সে বের করে ফেলবে তখন। রাসেশ্বরী ম্যাজিক দেখাচ্ছে তার সঙ্গে, সর্বাগ্রে এটাই তো নতুন খেলা, প্রধান আকর্ষণ। ভ্রাম্যমাণ কোনো সার্কাস-পার্টিতে পাকা-পোক্ত ভাবে ঢুকে পড়বে না-হয়। মেয়ে-মহলে রাসেশ্বরী একলা খেলা দেখাতে পারবে। একান্ত করে মেয়েদের উপভোগ্য কত নতুন খেলা তার ভাবা আছে যা শুধু মেয়েই পাবে দেখাতে। নতুন ঢঙে বক্তৃতা লিখে রাসেশ্বরীকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নেবে আস্তে-আস্তে। আগে বাঙলা পরে ইংরিজি। ব্যায়াম আর উপোস করিয়ে শরীরটাকে

একটু ঝবিয়ে নিতে হবে, সুষমাব সঙ্গে আনতে হবে একটু সৌষ্ঠব। আব, চামডাব উপবে ফুটিযে তুলতে হবে চেকনাই।

আব তবে ভাবনা কোথায়? সিন্দুকে কবে ভূতে টাকা বযে আনবে।

সদাশিবেব বুকেব থেকে শক্তিশেল খসে পডলো। সে হালকা পায়ে পাইচাবি কবতে লাগলো ঘবেব মধ্যে।

কতক্ষণ পবে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রাসেশ্বরী আবাব হাজিব। বললে, 'ম্যাজিক শিখে কী কববো জিগগেস কবছিলেন না?'

'হ্যাঁ। কী কববে?'

স্থিব চোখে চেয়ে থেকে বাসেশ্বরী বললে, 'যে লোক চলে যায় তাকে ফিবিয়ে নিযে আসবো।'

'সে আবাব কী কথা!' সদাশিব স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কেন, আপনার জানা নেই সেই ম্যাজিক? যাতে চলে-যাওযা লোককে ফিবিয়ে আনা যায?'

আশ্চর্য, বাসেশ্বরীব এতটুকু তবলতা নেই। কাঠিন্য, গাম্ভীর্য, স্পষ্টতা।

আশ্বাসভবা গলায সদাশিব বললে, 'আনা যায বৈ কি।'

এবাব লজ্জা এসে ছেযে ফেললো বাসেশ্বরীকে। মুখেব কাছে বুকেব আঁচল বাশীভূত কবে সে ছুটে পালালো।

তবে কি বাসেশ্বরীব টাকাব দুঃখ নয? সদাশিব তাব আগেব জাযগায এসে বসলো।

দুপুরবেলা পাতাল-প্রবেশ শুনতে-শুনতেই অনুপমা আচ্ছন্ন হযে এলো। আগে ছিল অর্ধেক এখন সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

প্রথমটা বাসেশ্বরী হৈ-চৈ কবলো না। অনুপমাব ছোট যে মেয়েটা ঘুমুচ্ছিলো মাদুবেব উপব সেটাকে বুকে কবে পাশেব বাডিব জিম্মায় বেখে এলো। পাশেব বাডিব সমবযসী ছেলেকে দিয়ে অনুপমার মাযেব ছেলেটাকে পেয়াবা খাওযানোব নেমন্তন্ন করালে, অর্থাৎ স্থানান্তবিত কবলে। বাডা ছেলেকে ইস্কুলে খবব পাঠালে দৌডে চলে আসবাব জন্য। আব, ডাকাতে হল, ডাকালে কবিবাজকে।

এতক্ষণ পাশের ঘরে নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছিলো সদাশিব। হঠাৎ তার উপর যেন একটা বাঘ পড়লো লাফিয়ে ‘উঠুন, উঠুন, শিগগির—’

সদাশিব চোখ চেয়ে দেখলো রাসেশ্বরী। এলোথেলো চুল, আঁচল স্রস্ত-বিস্রস্ত, ঘরের আগুনের থেকে যেন তাকে টেনে নিতে এসেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর। তক্ষুনি উঠে পড়বে না ব্যাপারটা একটু বুঝে নেবে ভাবতে চাইলো সদাশিব।

কিন্তু রাসেশ্বরী তাকে সময় দিল না। তার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে সোজা তাকে তুলে ফেললো বিছানা থেকে, টানতে-টানতে সোজা তাকে নিয়ে এলো অনুপমার কাছে, বললে, ‘দেখান, দেখান এবার আপনার ম্যাজিক। দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।’

‘এ কি, নেই?’ সদাশিব গুঙিয়ে উঠলো।

‘কাঁদলে চলবে না। আপনার ম্যাজিক দেখান বলছি, আপনার শেষ খেলা। টবের মরা গাছে ফুল ফোটান আপনি, দিদির দেহেও তেমনি প্রাণ নিয়ে আসুন।’ রাসেশ্বরী সদাশিবের বাহু ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল।

এ একরকমের শোকোচ্ছ্বাস, সদাশিব মনে করলো। বললে, ‘দাঁড়াও, একজন ডাক্তার নিয়ে আসি।’

রাসেশ্বরী দুয়ার আটকালো। বললে, ‘আমাকে ন্যাকা বোঝাতে হবে না। ম্যাজিকের কাছে ডাক্তার কিসের। গলা কেটে ফেলে জোড়া লাগাতে পারেন আর এর অসাড় জিভে কথা ফোটাতে পারেন না? ডাক্তার কখনো কাটা মুণ্ডু জোড়া দিতে পারে? তবে তার কাছে চলেছেন কী বোকার মতো? নিয়ে আসুন আপনার মড়ার হাড়, পরুন আপনার কালো পোষাক, অন্ধকার করে দিন ঘর, বাঁচিয়ে তুলুন আমার দিদিকে।’

সদাশিব অনুপমার শিয়রের কাছে বসে পড়লো।

ক্রমে-ক্রমে লোক-জন এসে জমা হতে লাগলো। বাঁশ কেটে তৈরি হলো শবশয্যা। ছেলেছোকরারা গামছা বাঁধলো কোমরে।

সত্যি-সত্যি যখন দিদিকে ওরা বের করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন রাসেশ্বরী মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে মাথামুড় খুঁড়ে বুক চাপড়ে অসম্ভব কান্না

জুড়ে দিল। এ রকম বিশ্বগ্রাবী শোকের মাঝেও একটা রূপ আছে, ভাবলো সদাশিব। এমন প্রসারিত আত্মবিস্মৃতির মাঝে।

কঠিন হাতে তাকে জাপটে ধরে তার অঙ্গবিক্ষেপগুলোকে সংযত করবার চেষ্টায় সদাশিব এগিয়ে গেল। গায়ে হাত ঠেকতে না ঠেকতেই রাসেশ্বরী তার দু'হাতের বুড়ো আঙুল দুটো সদাশিবের মুখের কাছে তুলে ধরে ব্যঙ্গ-বক্র গলায় বললে, 'ছাই, ছাই, ছাই ম্যাজিক জানেন আপনি।'

রাত নটার মধ্যেই দাহ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সদাশিব যখন বাড়ি ফিরলো সব সাঙ্গ করে, মনে হলো কত অল্পেতেই যেন রাত কত গভীর, কত অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

রাসেশ্বরী থেকে-থেকে করণীয় যা তা করছে, আবার একটু ফাঁক পেলেই অনুপমার রিক্ত তক্তপোষটার উপর উপুড় হয়ে পড়ে শোক করছে।

ছোট ছেলেমেয়ে দুটো পাশের বাড়িতেই থেকে গেছে, বড়ো ছেলেটা কম্বল বিছিয়ে মাটির উপর শোয়া সদাশিবেরই এক পাশে, ও-ঘরে অনুপমার তক্তপোষের উপর পড়ে আছে রাসেশ্বরী, কান পেতে শোনা যাচ্ছে তার নিদ্রাক্রান্ত নিশ্বাসের শব্দ, বড়ো বেশি স্তব্ধতা বলেই বোধহয় শোনা যাচ্ছে - আর দু' ঘরের মাঝখানে উচ্চ শিখায় জ্বলছে একটা লণ্ঠন।

ভয়ে সদাশিবের গা কেমন ভারী হয়ে উঠছে।

একটা স্বপ্ন দেখছিলো রাসেশ্বরী। কোথা থেকে কালো পোষাক-পরা কে-একজন জাদুকর এসেছে এ বাড়িতে, তার হাতের মড়ার হাড়ের ছোঁয়া লেগে দিদির অবশ অঙ্গ নড়ে উঠেছে, দেখতে-দেখতে বন্যার জলের মতো দিদির শরীরে নেমে এলো স্বাস্থ্যের উচ্ছ্বাস, লাবণ্যের প্লাবন। দেখতে-দেখতে দিদির বদলে দিদির জায়গায় দিদির তক্তপোষের উপর চলে এলো সে—রাসেশ্বরী। দিদির থেকে সে এলো বেরিয়ে—ডিমের থেকে মুরগির মতো। অদ্ভুত ম্যাজিক—দিদির অসুখ কেমন সারিয়ে দিল সেই জাদুকর।

'অদ্ভুত ম্যাজিক—তোমার দিদিব অসুখ কেমন সাবিয়ে দিলাম, কেমন বাঁচিযে তুললাম তোমার দিদিকে।' বাসেশ্বরী তাব পিঠেব উপব অনেক খানি জাযগা জুড়ে গবম একটা হাতেব স্পর্শ পেল, কে যেন তার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদু অথচ অতি গাঢ় স্বরে বললে, 'তোমাব দিদি কেমন বদলে গেল, নতুন হয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে। টবেব মবা গাছ কেমন ফুলন্ত হয়ে উঠলো চোখেব সামনে। কেমন সে ফিবে এলো তাব নিজেব ঘবে নিজেব জায়গায নিজেব তক্তপোষে। ম্যাজিক—ম্যাজিক—'

'কে?' বাসেশ্বরী ভীত অথচ প্রখব আর্তনাদ কবে উঠলো।

কেউ নেই। কাউকে দেখা গেল না।

তবু ভয় গেল না বাসেশ্বরীব। ধড়মড় কবে উঠে বসলো। ঘবেব চাবদিকে চেয়ে দেখলো, কেমন বিশ্রী অন্ধকাব। চেয়ে দেখলো লণ্ঠনেব শিখাটা অনেক নিচে নামানো, দবজাব এক পাশে আড়াল দেয়া।

'কে, কে এখানে?' বাসেশ্বরী চেঁচিযে উঠলো।

কোনো সাড়া-শব্দ নেই, কেউ দাঁড়িযে আছে বলেও মনে হয় না।

তবু একটা উপস্থিতি বুকেব উপব পাথবেব ভাবেব মতো বাসেশ্বরী যেন অনুভব কবলো। বললে, 'কে? ভূত? কথা নেই কেন তবে?'

'আমি ম্যাজিক—' অন্ধকাবেব মধ্যে থেকে কে অস্পষ্ট শব্দ কবে উঠলো।

'ম্যাজিক দেখাতে এসেছিলেন? কিসেব?' নিজেকে অনেক হালকা বোধ কবলো বাসেশ্বরী। তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্ধকাবেই বিশৃঙ্খলাগুলোকে সে সংযত কবলে। বললে, 'বলুন, ম্যাজিকটা কিসেব?'

অদৃশ্য দুটো হাত বাসেশ্বরীর দুই হাত হঠাৎ শক্ত কবে চেপে ধবলো। তাবপব যাব হাত সে বললে, 'চলে-যাওযা লোককে ফিবিযে আনাব ম্যাজিক। এক দিন দেখতে চেয়েছিলে না? আজ দেখ—দেখ—'

'দাঁড়ান,' বাসেশ্বরী হেসে উঠলো · 'আলোটা বাড়িয়ে নি। আলো না হলে দেখবো কি কবে?'

হাত খসিয়ে নিয়ে বাসেশ্বরী দবজাব কাছে গিয়ে লণ্ঠনেব পলতেটা উঁচু করে দিল। আলোটা হাতে নিযে এগিযে এসে দেখলো, সদাশিব, কালো পোষাক পবা, হাতে জাদুকবেব কাঠি, মড়াব হাড়।

রাসেশ্বরী খিল-খিল করে হেসে উঠলো। লণ্ঠনটা উঁচু করে সদাশিবের মুখের কাছে তুলে ধরে সে বললে, 'চলে-যাওয়া লোককে ফিরিয়ে আনার ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন? কিন্তু আপনি কি আমার সেই চলে-যাওয়া লোক?'

বলে লণ্ঠনটা সদাশিবের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে রাসেশ্বরী পাশের ঘরে গিয়ে সদাশিবের ছেলের পাশে কম্বলের উপর শুয়ে পড়লো।

বিষ্ণু দে

এক চৈনিক যক্ষের-গান

বৃষ্টির নীল ইসারা দূরে, মাঠের পারে
তালদীঘি আর রূপনারাণের ফ্যাকাসে চরে।
বাতাস বইছে ঝাপ্‌সা মৃদু—
সে কালে কবির দিগঙ্গনারা ছড়াত সীধু।

কদমের শাখা কেঁপে কেঁপে মরে—হাওয়ায় কাঁপে
স্তম্ভিত তালও হঠাৎ নড়াছে, রুদ্ধশ্বাস
ঝক্‌ঝকে চাঁপা ঝরে' ঝরে' পড়ে—আবেগভারে
বাতাস ঘনায় হাল্‌কা অনেক ধুলার চাপে।

ওড়নায় মুড়ি দিয়ে' ছুটে' যায় ঊর্দ্ধশ্বাস,
গায়ে গা ছোঁয়ায়, বিদ্যুৎ-চেরা শিহর ছাপে
মুখ ঢেকে ছুটে' চলে' যায় কোথা যায় বাতাস।
বৃষ্টির দূর ইসারা ধূসর বাতাসে কাঁপে।

বজ্রনিশানে হঠাৎ নিথর নীরব বাতাস
ধুলা আর ধুলা মুঠি মুঠি ওড়ে শুকনো ভিজা
বাতাস ওড়ায় সবই সবই।
হৃদস্পন্দন শুনি একা একা রুদ্ধশ্বাস।

যোজন যোজন আকাশ ছড়াল দূর আকাশে
লাফিয়ে লাফিয়ে দুরন্ত পায়ে বৃষ্টি আসে।
তুমি কোথায়?
বৃষ্টিতে মেঘে একাকার হল আকাশ নদী।

এক চৈনিক যক্ষের গান

পাখীরা পালক মেঘের মধ্যে ডোবায় কেন?
আকাশের নেই কূলকিনারা
সারাটা বিকাল ভেবেই সারা তুমি কোথায়।
পাখীদের পিঠে চিঠিটা তোমার দিই পাঠিয়ে'!

পূবদিকে স্রোত, একটি মেঘের ঢেউ কি আসে
তোমার সুদূর খবর নিয়ে।
ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ ডোবায় এক এক করে'
পাঁপড়ি খসায় নীলনবঘন দীর্ঘশ্বাসে।

ঢেকে দিই ছবি, চিঠিগুলো রাখি ছবির ফ্রেমে
বাংলোর একা অজ্ঞাতবাসে সুদূর প্রেমে
হৃদ্‌স্পন্দন শুনি বসে' বসে', একেলা ভাবি
পুরানো দিনের পদাবলী-গান
আজকের রাত কাটাও আমার পাশে॥

জীবনানন্দ দাশ

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধাবণ আমি আজ,—চিবকাল ;—আমাব হৃদয়ে
পৃথিবীব দণ্ডীদেব মত পবিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমেব আলোব দিকে চেযে,
তাবপব ভোববেলা যদি আমি হাত পেতে দেই
সূর্য্যেব আলোব দিকে,—তবুও আমাব সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিযে
হৃদযঙ্গম কবে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতাবা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনবায় তুলে নেয় অপূর্ব্ব গেলাস ,
উত্তেজিত না হযেই অনাযাসে ব'লে যায তাবা ·
হেমন্তেব ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফ'লেছিল,
অথবা কোথায কালো হ্রদ ঘিবে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
বজ্রাতিপাতেব দেশে ব'সেও তাদেব সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালি ফসল, হ্রদ, সিঙাড়াব ছবি ,
আমার প্রেমিক সেই জলেব কিনাবে ঘাসে—দক্ষ প্রজাপতি ,
মানুষ-ও-ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ ক'বে দিযে যাবে অনাগত কবি,
একদিন হয়তো বা ;—আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমাব হৃদয়
যে সব পবিত্র মদ দিযেছিল—যে সব মদিব
আলোব বঙেব মত ম্লান মদ দিয়ে গিযেছিল,—
যখনি চুমুক দেই হয়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থিব।

অমিয় চক্রবর্ত্তী

ইরাণ

পাহাড়ী ইরাণী গ্রাম।
মোটরে যাচ্ছিলাম
আফিম ক্ষেতের বুকে থাম্‌ল :
ফুলে ফুলে নাম্‌ল
থম্‌থমে রঙীন আকাশ
তপ্ত মৃদু শ্বাস।

কাস্‌বিন্‌-কের্‌মানের রাস্তায় স্থিতি
ধুলোয়মাখা দুদণ্ডের অতিথি—
থার্মোস্‌ থেকে খেয়ে জলের ঢোক
এক পা নেমে ব্যস্ত তাকাই ম্যাপে   কোথায় আছি ?

অচিন পল্লী, অন্য জীবন, ভিন্ন ভাষা, টুপির তল কৌতূহলী চোখ
দাঁড়াল কাছাকাছি
এতটুকু পুঞ্জ জনতার ক-টা লোক।

কোথায় আছি ?
—মেলে তৃপ্তির ফসল, সবুজ আঁচলা, পাশে রুক্ষ পাহাড়ের ঢেউ
হর্ষের চীৎকারের তলে তলে বল্‌ল কেউ
(শুন্‌তে পাইনি ভালো ক'রে)
আছ ঝিরিঝিরি উইলো মর্ম্মরে
ঝিরঝিরে ফিতে ঝর্ণায় ,
কার্পেট-বিছানো পুরু ঘাস বন-বর্ণায়
বোসো, বেলা হোক্‌ শেষ
এই তো পৃথিবীর দেশ।

অমিয় চক্রবর্ত্তী

চাকার তলে
দ'লে যাই চলে
পেট্রলের গন্ধে ভ'রে, অভাবনীয় যুগ ধূলোয় উড়িয়ে
উন্মন হাওয়া গুঁড়িয়ে
প্রগতির এক বাঙালী।
ঘরে ফিরে লিখি দাসখৎ, আমি প্রবাসী, হারানো দুপুরের কাঙালী॥

হরপ্রসাদ মিত্র

পুনর্মিলন

কবরের চারি পাশে
একরাশ সাদা বুনো ফুল।
কাদাখোঁচা চেয়ে থাকে,
কাঁচা পথে ভেঙে গেছে পুল।
'ভৈরবে' এলো বান,
আজ তা'র কী করাল জল।
মুখ তা'র যতো ম্লান
খুঁজে ততো পাবে নাকো তল।

প্রাক্তন দ্যুতি নেই।
নিষ্প্রভ হোক সে, নতুন।
শাদা শাড়ী থালি পারে
নহে আজ কপোত নোটন।
শিয়রে নিবিড় মেঘ,
ঠোঁটে হাসি ক্ষীণ হ'লো বুঝি।

* * *

এলে শেষে বহুদূর
এই ঠিকানাটি খুঁজি খুঁজি।

হুমায়ুন কবির

ভারতীয় চিত্র

জাতির শাশ্বত স্বাক্ষর থেকে যায় তার শিল্পে। রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনীতে ইতিহাস মুখর কিন্তু সে পট পরিবর্ত্তনের ছায়াপাত বিশ্ব-মানসে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় না। দর্শনের ক্ষেত্রেও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই একই পরিণাম। সূক্ষ্মতার ভীড়ে মূলের চেহারা চাপা পড়ে যায়, বুদ্ধির কূট তর্কে সত্যের প্রাণবস্তুই হয় বিনষ্ট। শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু যা মৌলিক, যা সহজ তাই থেকে যায়, জাতির চেতনার উপর তা-ই রেখাপাত করে। এই জন্যই জাতীয় শিল্প দেশবাসীর অন্তরের মর্ম্মকথা উদ্ভাসিত করে, যুগযুগান্তর ধরে বংশপরম্পরায় তার স্বরূপ এবং গতির নির্দ্দেশক হয়ে দাঁড়ায়।

শিল্পের মধ্যে চিত্রাঙ্কনকে মৌলিক এবং চিরন্তন বলা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগের জন্যই ভাষা, কাজেই সমাজের রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গীতকে মৌলিক বললেও শাশ্বত বলা চলে না। যে অনুভূতির ফলে তার সৃষ্টি, তা যেমি চঞ্চল তেমি নিরাবয়ব, কাজেই অন্তরের অন্তস্থলে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেই তার ক্ষান্তি। এই অরূপ আবেদনেই সঙ্গীতের বিশ্বজনীনতা, কিন্তু প্রকৃতির এ অনির্দ্দেশ ইঙ্গিত-ঐশ্বর্য্যের ফলেই সঙ্গীত কোনো জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে অনুপযুক্ত।

জাতিগত বা সাময়িক চিত্ত-বৈচিত্র্য বিকাশের সুযোগ রেখেও চিত্রকলা মানুষের মূলগত প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে পারে। প্রাচীন পারস্য-চিত্রের সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ সূচিকর্ম্মের মতন চীন শিল্পের বাহুল্যবর্জ্জিত মিতাচারও জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ওলন্দাজ বুর্জ্জোয়া সভ্যতার নিবিড় পরিতৃপ্তি, এবং আধুনিক ইয়োরোপের উৎপীড়িত আত্মা এই দুই যুগের চিত্রে যতটা নিখুঁত ও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, অন্য কোনো শিল্পে কি তার তুলনা মেলে? অন্যান্য দেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ভারতীয় চিত্রকলার বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি।

ভারতীয় চিত্র

ভারতীয় চিত্রকলার অতীত ইতিহাস দীর্ঘ এবং বিস্মৃতির ছায়ায় তার অনেক রেখাই লুপ্ত বা বিলীয়মান। আজ তার আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। উপর্যোপরি বৈদেশিক আক্রমণের তরঙ্গাঘাতের পরেও তার যে সম্পদ অবশিষ্ট ছিল, বিরূপ আবহাওয়া এবং সময়ের বিনাশী প্রভাবে তা-ও এখন প্রায় অন্তর্হিত। অজন্তা গুহায় যে চিত্র সম্পদ, ত্রিকালজয়ী চিত্রপদ্ধতির স্মৃতি তার মধ্যে আজো লুকিয়ে রয়েছে। অজন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে রূপায়নের অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির মধ্যেও দৃঢ় ও স্পর্শমান জগৎকে অতিক্রম করবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই অন্তর্লীন। ভারতবর্ষের নিদাঘের দাহ এবং দীপ্তি দুইই এত তীব্র যে আলোকের প্রাচুর্য্যে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র অবয়বের অস্পষ্ট আভাস জেগে থাকে। অজন্তার তুলনায় রাজপুত ও মুঘল চিত্রের সূক্ষ্ম কারুকলা এত বিভিন্ন যে তাকে দ্বন্দ্বমূলক ভাব-সম্ভূত মনে হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার তীব্র প্রেরণার চিহ্ন সেখানে নেই। দরবারী সংস্কৃতি সেখানে কারুকলার প্রতি লক্ষ্য রেখে চিত্রে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাব্যের স্থান করে দিয়েছে। মানুষী শক্তির সহ্যের বাইরে অনুভূতিকে প্রসারিত করবার চেষ্টায়ই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অধ্যাত্মিকতার প্রশ্রয়। বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করবার প্রয়াস ও সংযম থেকে রাজপুত ও মুঘল চিত্রের কাল্পনিকতা উদ্ভূত। একটি তাই আবেগ-প্রধান ও চঞ্চল, অপরটি স্থবির ও আত্মসমাহিত।

তারপর এলো পরাজয়ের যুগ। ভারতীয় চিত্ত সেদিন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পতনের পথে অগ্রসর। মুঘলোত্তর যুগের রাষ্ট্রিক অধঃপতন সেদিন জাতির মানসেও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তখনকার সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে বিকলনের চিহ্ন পরিস্ফুট। শিল্পের বিষয়-বস্তু তখন পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট এবং তাদের রূপায়নেও বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। অভিজ্ঞতার সম্পদ বা গভীরতা নেই, আছে শুধু পুরাতন বিষয়ের অবাস্তব বিস্তৃতি। এক কথায় সে যুগে ভারতের প্রাণশক্তি নিবীর্য্য এবং তার অভিজ্ঞতা বন্ধ্যা, তাই সে যুগের শিল্প-অভিব্যক্তিও অসার ও ব্যর্থ।

তারপর একদিন পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হল। ইয়োরোপীয় সভ্যতা তার প্রথম পূজারীদের বিহ্বল ও অভিভূত করে ফেলেছিল। মেকলের মত অনেকেই বিশ্বাস করতেন, প্রাচ্যের বহুযুগ সঞ্চিত জ্ঞান-

ভাণ্ডারের চেয়ে এক শেল্ফ ইংরেজি বই অনেক বেশি মূল্যবান। এ রকম বাড়াবাড়ি স্বাভাবিক এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কায় বিচার-বোধের ভেসে যাবারই কথা। পাশ্চাত্যের মহত্তম সাধনার তখন যতটা প্রশংসা ও অনুকরণ হয়েছে, তার স্থূলতার পূজাও তার চেয়ে কম হয়নি। চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বাজারী শিল্পের স্থূল অনুকরণই হয়ে উঠল তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তা একটা দিক মাত্র এবং ক্ষণস্থায়ী। সূক্ষ্ম শিল্পান্বেষী ভারতীয় মনে স্বভাবতই পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিকের আহ্বান জেগে উঠল এবং তেম্নি ইয়োরোপীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ ভারতীয় শিল্পের আত্মাকে পুনরাবিষ্কার করবার জন্য ব্রতী হলেন। এ প্রসঙ্গে হ্যাভেলের নাম শ্রদ্ধেয়। ভারতীয় শিল্পের এবং তার অন্তরাত্মার তিনি যে ব্যাখ্যা করলেন, তাতে ভারতীয় ছাত্রদের মনে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করল।

ভারতীয়দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের নামই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য আঙ্গিকে শিক্ষা লাভ করেও স্বেচ্ছায়ই তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি বর্জ্জন করে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির পুনরাবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আঙ্গিকে তাঁর যে প্রাথমিক শিক্ষা, তা ব্যর্থ হয়নি। ইয়োরোপীয় চিত্রপদ্ধতিতে শিক্ষিত বলেই তিনি চিত্রাঙ্কনে রেখার যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর অর্জ্জিত বিদ্যার ব্যবহারে স্বধর্ম্মের প্রকাশ পেয়েছে। ইয়োরোপের চিত্রকলার আদর্শ বাস্তবের সুসংবদ্ধ সংহতি; কিন্তু বাস্তবের অতিক্রমণই অবনীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তাঁর শিল্পে বস্তুর স্থূলত্ব-ভারও কামনার উদ্বেলতায় দ্রবীভূত ও তরল। পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল না কিন্তু তাঁর শিল্পে যে আত্মার প্রকাশ, অমর প্রাচ্যের সাধনায় তা ভাস্বর।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রশিল্পের এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করলেন। তাঁর পরীক্ষায় পাশ্চাত্য প্রতিকৃতি যেমন স্থান পেল, নূতন পদ্ধতির জন্য তেমনি তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সুদূর প্রাচ্যের ঐতিহ্যে। পদ্ধতি তাঁর বহুবার বদলেছে, কিন্তু তাঁর কেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের বং বদল হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মৌলিক সত্তার উপর তাঁর নিবিষ্টতাকে

অনেকেই কিন্তু ভুল বুঝল। যে আদর্শের ভাবগত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল, অনুকরণকারীরা তার বাহ্যিক পুনঃপ্রবর্তনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নবযুগের নব জন্মের বদলে তাদের সাধনা হল পুরাতনের পুনরুজ্জীবন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি হয়ে থাকে—যার বহুপূর্ব্বেই স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল, উন্মুখর জাতীয় চেতনা অনেক সময়ে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে এমন সব বস্তু টেনে আনে। উন্মাদনা রূপায়িত হল ভাবালুতায়, ভারতীয় রূপকল্প পর্য্যবসিত হল বাঁধাধরা রূপকে প্রাচীনের কঙ্কাল-শাসন কেবল রাজনীতিরই মৃত্যুদণ্ড নয়, বহুক্ষেত্রে চিত্রশিল্পেও সে কঙ্কাস-শাসন নবজন্মের বিরোধী। বহু ক্ষেত্রেই চিত্রশিল্প হয়ে উঠল নিছক চিত্র, কাহিনীর চিত্র-রূপ, যার প্রাণবস্তু বলে কিছু নেই।

মণ্ডন এবং অঙ্কনের বন্যাকে যাঁরা উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন এ স্বল্পায়তন প্রবন্ধে তাঁদের মধ্যে কেবল দুজনের নাম করা চলে। কেবলমাত্র পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্যই নয়, রেখাঙ্কনের দৃঢ়তার জন্যও নন্দলাল বসুকে ধ্রুব-শিল্পী বলে স্বীকার করতে হবে। তাঁর চিত্রকলা বাস্তবমুখী ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। গুরু অবনীন্দ্রনাথ হতে তিনি এ হিসেবে স্বতন্ত্র যে দৃঢ়তার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য। সংকীর্ণ সংজ্ঞা অনুসারে বাস্তবপন্থী না হয়েও, সূক্ষ্মতাবোধ ও রেখা-দক্ষতায় তিনি শিল্পীদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠায় অগ্রণী। অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করবার ইচ্ছা তাঁর নেই, অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুকে শিল্পের চিরন্তনতায় উন্নয়নই তার লক্ষ্য।

যামিনী রায়ের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আদর্শোপলব্ধির জন্য তিনি তাই সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকের শরণ নিয়েছেন। তাঁর শিল্পে সামান্য বস্তুও অনুভূতির তীব্রতায় প্রায় বিপর্য্যস্ত বিরাটের সীমায় এসে উপস্থিত হয়। রেখার হ্রস্বতায় যে গাম্ভীর্য্য ও সারল্য ফুটে ওঠে, তা যেম্নি আশ্চর্য্য তেম্নি অসাধারণ। যে দেশে সহজ সাধারণ বস্তু অতিমাত্রায় প্রচলিত, সেখানে তিনি নিবিড় সাধনায় একান্তভাবে অপ্রচলিত প্রাণবস্তুকেই আঁকড়ে রেখেছেন। লোকশিল্পের সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্পষ্ট এবং তাঁর চিত্রে তাই লোকশিল্পের নৈর্ব্যক্তিক এবং শাশ্বত ভঙ্গী সহজেই ধরা পড়ে।

তাঁর শিল্পের শক্তি ও দার্ঢ্য যেমি বিদ্রোহাত্মক, তেমি উদ্দীপক। ভবিষ্যৎ ভারতীয় শিল্পের অগাধ প্রতিশ্রুতিতে তা পরিপূর্ণ।

কৃতী শিল্পী আরো অনেকে আছেন, কিন্তু স্থানাভাবে তাদের প্রতি সুবিচার করা আজ অসম্ভব। কেবলমাত্র দু'এক কথায় বলতে গেলে চারুতাই রেখার সৌকুমার্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা তার ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত গভীরতাকে প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক ইয়োরোপীয় চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্র শিল্পকলার যোগাযোগ বিস্ময়কর। সে সম্বন্ধে 'চতুরঙ্গে' বিস্তৃততর আলোচনা করেছি। এখানে কেবল এইটুকু বল্লেই চলবে যে জাতির অবচেতন মানসে রবীন্দ্রনাথ শিল্প-ঐশ্বর্যের যে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, তার প্রকাশ তাঁকে একদিকে যেমন প্রাচীনতম শিল্পরীতির সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করতে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে অধুনাতম শিল্পপরীক্ষার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিপদ্ধতিকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করে তুলেছে। বিভিন্ন প্রকৃতির বাহনকে আশ্রয় করে যুগধর্ম্ম তার সত্তাকে কি অদ্ভুত উপায়ে ফুটিয়ে তোলে, তার এত বড় দৃষ্টান্ত সহজে মেলে না। এ সমস্ত দেখে জোর করে কেবল এইটুকু বলা চলে যে ভারতবর্ষ অনুকরণের যুগ পেছনে ফেলে এসেছে এবং বিশ্বের সঙ্গে তার যে নূতন পরিচয় হবে, সে পরিচয় হবে তার নিজেরই পথে। সে পথের নির্দ্দেশ আজ আর ভুল করবার সম্ভাবনা নেই।

বুদ্ধদেব বসু

ব্ল্যাক-আউট

যাক্, এতদিনে তবু কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদ উঠলো, ফুটলো অন্ধকার, এতদিনে সম্ভব হ'লো একটি সত্যিকার অন্ধকার ঘরে ঘুমোনো। খাট যেমন ক'রেই ঘোরানো হোক্, যেদিকে মাথা ক'রেই শোয়া যাক, কোনো-না-কোনো জানলার কোনো-না-কোনো ফাঁক দিয়ে পথের বিজলী আলো আর চোখে এসে লাগে না—রাস্তার সব আলো গেছে নিবে। ঘরের ঘোমটা-পরানো বিমর্ষ আলো যেই নেবালুম, জেগে উঠলো অন্ধকার। কালো, কালো।

বিশেষত এই বর্ষার মেঘে-চাপা রাতগুলিতে অন্ধকারের অতল লাবণ্যে চোখ ভ'রে নিচ্ছি। ফাঁকি নয়, মেকি নয়, একেবারে আসল, নিছক, জমাট অন্ধকার—রাসবিহারী এভিনিউর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বকধ্বক ক'রে জ্বলছে। অন্ধকার জ্বলছে শুনে ভাষাতত্ত্ববিদ মুখ বাঁকাবেন না, প্রান্তরে কি নদীর উপরে কি রাত-চেরা রেলগাড়ির দু'দিকে অন্ধকার সত্যি জ্বলে, যার চোখ আছে তারই চোখে পড়ে। শহরে আমরা অন্ধকারকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত নির্জীব ক'রে রাখি, পার্কে একটুখানি ছায়া-ঢাকা বেঞ্চির জন্য কত খোঁজাখুঁজি। কিন্তু সাংঘাতিক জখম হ'য়েও এই কলকাতায় অন্ধকার যে মরেনি এবার তার প্রমাণ হ'লো। যেই না সুযোগ পাওয়া, অন্ধকার জেগে উঠলো তার সমস্ত আদিম রূপ-যৌবন নিয়ে। এই নিষ্প্রদীপ-আদেশ যেন অন্ধকারের পুনরুজ্জীবন উৎসব। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশ থেকে নামলো স্নিগ্ধচিক্কণ অবলুপ্তি, নিজের বাড়ি হাৎড়ে খুঁজে ফিরি, আগন্তুক বাড়ি চিনতে না-পেরে ফিরে যান। বাড়িগুলি বেশির ভাগ গা-ঢাকা দিয়ে চুপ, ভিতরে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না, অনেক লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়, এরই মধ্যে হঠাৎ যদি দু'একটা জানলা জ্বল্‌জ্বল্ করে মনে হয় বুঝি স্বর্গের কোনো জানলা গেছে খুলে, আর

কোনো ক্লান্ত অপ্সরী সেখানে মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর রাত বাড়ে—শুতে যাবার আগে একবার রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়াই—এ কী অতল অকূলে চোখ হারায়, মন ডুবে যায়। রেলগাড়ি শেয়ালদা স্টেশনের আঙিনা পার হওয়ামাত্র হঠাৎ যে-অন্ধকার দৃষ্টির দিগন্ত-সীমা পর্যন্ত দখল করে, এও সেই। আশ্চর্য!

আর শুধু কি অন্ধকার! সেদিন স্পষ্ট দেখলুম শহরের শান-বাঁধানো পথ জ্যোছনায় হেসে উঠেছে। সন্ধের পর বাস্ থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটছি—হঠাৎ দেখি, এ কী। এ যে জ্যোছনা। বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সত্যি তা-ই। সমস্ত রাস্তাটিতে একটি স্বচ্ছ নীল আভা, যেন এইমাত্র ভোর হ'লো। গাছগুলির পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ভূতুড়ে মূর্তির ঝিকিমিকি দেখলুম, হেঁটে-যাওয়া মানুষগুলোর পায়ের তলায় শান্ত চান্দ্র একটি ক'রে ছায়া—তাও দেখলুম। মাথার উপর মুক্তো-ছিটোনো আকাশে মস্ত চাঁদ চুপ। মন কেবলই বলতে লাগলো—এ কী। এ কী হ'লো। কলকাতা এ-সব পেলো কেমন ক'রে? মেঘ যখন কেটে যাবে আকাশ ভ'রে তারাও ফুটবে, কলকাতার কতদিনের মরা আকাশ হঠাৎ আদিম আনন্দে বেঁচে উঠবে।

এ-কথা মানতেই হয় যে ব্ল্যাক-আউট এসে আমাদের বরাত খুলে দিয়েছে। আমরা নগরবাসীরা বড়োই গরিবের মতো দিন কাটাই, আমাদের জীবনে জ্যোছনা নেই, অন্ধকার নেই, আকাশ নেই, বছরের পর বছর বর্ষা আসে, তার স্পর্শ পাই না, কখন বসন্ত এসে চ'লে যায়, বোঝাই যায় না। ঋতুর সমারোহ সব ব্যর্থ, আকাশের বাতাসের মেঘের গাছপালা-ফুল-পাখির এত মন্ত্রণা সব মিথ্যা। খিদের সময় না-খেলে যেমন খিদে ম'রে যায়, তেমনি আমাদের চিরবঞ্চিত ইন্দ্রিয়গুলোর অভাববোধই যায় নষ্ট হ'য়ে—দিনের পরে দিন কাটে, মনে হয় বেশ তো আছি, যা-কিছু দরকার সবই আছে। সবই আছে—তা ঠিক; ট্রাম আছে, বাস্ আছে, স্যানিটরি বাথরুম আছে, টেলিফোন আছে, রেডিও আছে, কিন্তু কী যে নেই, আর কতখানি যে নেই তা বুঝতে পারি কলকাতার বাইরে গেলেই। কলকাতার বাইরে, চোখ যখন আকুল হ'য়ে আকাশে ছোটে, আর মাটি আর জল, ঘাস আর ঘাসের গন্ধ যখন চারদিক থেকে বন্ধুর মতো এসে জড়িয়ে ধরে তখন বুঝতে

Raphael's Insignia!

পারি যে আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের এ-পিপাসা মরবার নয়, শহরের ইঁট-পাথর-মানুষের চাপে তা নির্জীব হ'য়ে থাকে মাত্র, অনুকূল আবহাওয়া পেলেই আবার তীব্র হ'য়ে ওঠে। পিপাসা তৃপ্ত হবার সুযোগ যেখানে, সেখানেই পিপাসা ওঠে বেড়ে; যেখানে তৃপ্তির কোনো আশাই নেই সেখানে আমাদের অচেতন মন পিপাসাটাকেই চাপা দিয়ে রাখে, এ হয়তো জীবের আত্মরক্ষারই একটা কৌশল। নয়তো এই কলকাতায় রাতের পর রাত জ্যোছনা না-দেখে, অন্ধকার না-চেখে, দিনের পর দিন আকাশের অজস্র উন্মুক্ততা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, বছরের পর বছর ঋতুরঙ্গের অংশীদার না হ'য়ে আমরা কেমন ক'রে বাঁচতুম।

আমরা যারা কলকাতায় রয়েছি, আমাদের বরাত এতদিনে তাহ'লে খুললো। কথাটা নিঃসংশয়ে, সম্পূর্ণভাবে বলতে পারলে খুশি হতুম। কিন্তু এই নিষ্ঠুর নগর এক হাতে দিয়ে আর-এক হাতে কেড়ে নেয়। ঐশ্বর্য ছড়ানো আমাদের সামনে, কিন্তু উপভোগে কত যে বিঘ্ন। কথাটা যদি কেউ জড়বাদী অর্থে গ্রহণ করেন আপত্তি করবো না, আমাদের জৈব জীবনের ক্ষেত্রে কথাটা মর্মান্তিক রকমেই সত্য। যে-সব শারীরিক ও মানসিক সুখ-সম্ভোগ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তাদের কথা ছেড়েই দিনুম, কলকাতায় বড়োলোকের বাড়িতে ছাড়া চাঁদও আলো দেয় না, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে হেঁটে দেখেছি, গাছে-পালায় নির্জনতায় ধোঁয়াহীন খোলা হাওয়ায় পল্লীটিকে বেশ মনোরম ব'লেই বোধ হয়েছে, এমনকি উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারাও চোখে পড়েছে। এদিকে আমরা পাঁচজন যে-সব পাড়ায় যে-সব বাড়িতে থাকি সেখানকার ব্যবস্থা একেবারেই অন্যরকম। এ-ভেদনীতি এতদিন নীরবে সহ্য করছিলাম, কিন্তু এই সাম্যবাদী ব্ল্যাক-আউট আমাদের মনে দারুণ দুরাশা জাগিয়েছে। সত্যি বলবো, এই অকুণ্ঠিত জ্যোছনা আর নিবিড় অন্ধকার দেখে নিজেকে হঠাৎ ভাবি বড়োলোক মনে হচ্ছিলো, কিন্তু এ নিয়ে মন খুলে যে উচ্ছ্বাস করবো তার উপায় নেই। আলো তো নিবলো, কিন্তু গোলমাল কে থামাবে। কলকাতা নিষ্প্রদীপ হ'য়ে পল্লীপ্রকৃতির অনুকরণ করছে অথচ ট্র্যাফিকের কাংস্য কলরোল যেমন ছিলো তেমনি আছে—না, বরং আরো বেড়েছে যেন, অন্ধকারে পাছে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখে ভাত

শশধব ঘোষেব বড মেয়ে শ্রীমতী বেলাবাণীব প্রথম ছেলেব মুখে ভাত দেওযা হবে। ভোজ বান্নাব জন্য গগন ঠাকুবকে ডেকে পাঠান হ'ল। একবাব, দু'বাব, তিনবাব। আসব ব'লেও গগন আব আসে না। শশধব উদ্বিগ্ন হলেন। বেলাবাণীব ক্রোধেব সীমা বইল না।

ওব পাযা ভাবি হযেছে বাবা। নটববকেই ডেকে পাঠাও না ?

আজকেব দিনটা দেখি। কাল তাই ডাকব। বলে' শশধব মোটবে চেপে আপিস্ গেলেন।

উডিযা ঠাকুব নটববেব সঙ্গে গগনেব পার্থক্য অবশ্য অনেকখানি, নইলে আব এভাবে বাব বাব ডেকে পাঠিযে অপেক্ষা কবা কেন। গগনকে ভাব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওযা যায। কত লোক খাবে আব কি খাবে ব'লে দিলেই গগন ফর্দ্দ ঠিক ক'বে দেয, হিসাবে তাব কখনো ভুল হয না। জিনিষ কম পডাব বিপদ আব অপচযেব আপশোষ, কোনটাই সে ঘটতে দেয না। বান্না গগনেব খাবাপ হযেছে এমন কথা কোনদিন কাবো মুখে শোনা যায নি। মধ্যাহ্নেব নিমন্ত্রিতদেব বেলা পাঁচটায আসনে বসানো তাব স্বভাব নয। থাকে সে পবিচ্ছন্ন, কাজও কবে পবিষ্কাব। বান্নাঘবেই হোক আব অস্থাযী চালাব নীচেই হোক, তাব বান্না কবা দেখে অত্যন্ত যে খুঁতখুঁতে মানুষ তাবও খিদে কমে যাবাব ভয থাকে না।

তাছাডা, মানুষটা সে জানাশোনা। কযেক মাস সে এ বাডীতে কাজ কবেছে। বেলাবাণীব বিযে হ'ল পৌষেব শেষে, তাব আগেব শ্রাবণেব শেষে গগন চাকবী কবতে এল ন'টাকা বেতনে। শ্রাবণেব পব ভাদ্র, ভাদ্রমাসে বিযে পৈতে কোন শুভকর্ম্ম হয না। পেশাদাব ঠিকে বামুনবা কাবো বাডীতে যদি বাঁধা কাজ কবে তো কবে বছবেব ওই একটি মাস, বসে থাকাব বদলে থাকা খাওযা আব বেতন পাওয়া যায, অন্য সময

এ কাজ তাদেব পোষায না। আশ্বিন মাস সুরু হ'তে না হ'তে ডাক আসতে লাগল নানা যায়গা থেকে, গগন কিন্তু কাজ ছাড্ল না। যে বৌ নেই তাকে মেবে, যে ছেলে কস্মিনকালে ছিল না তাব অসুখ ঘটিয়ে এবং আরও কয়েকটা মিথ্যা ছুতাব ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দু'এক যায়গায় বেঁধে এসে সামান্য যে উপবি বোজগাব হ'ল তাতেই সে যেন খুসী হয়ে বইল। বিদায় সে হ'ল বেলাবাণীব বিয়েব ভোজ বেঁধে। বাডীর বামুনেব বাডতি পাওনা হয না, এই হিসাব ধ'বে শশধব তাকে বখ্‌শিস্‌ দিতে গেলেন দু'টি টাকা। গগন দাবী কবল দশ টাকা। টাকা দু'টি নিযে কোমবে গুঁজে দাবীটা জানিযে বাগ কবে' সে বিদায হয়ে গেল।

বিকালে দেখা গেল, শশধব গগনকে একেবাবে গাডীতে চাপিয়ে বাডী ফিবেছেন। আপিস থেকে ফিবে ঘবোযা জীবনেব জন্য প্রস্তুত হ'তে শশধবেব ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। গগনকে বসিয়ে তিনি প্রস্তুত হ'তে গেলেন, বেলাবাণী খবব পেযে ফোঁস ফোঁস কবতে কবতে ওপব থেকে নেমে এসে বলল, তোমাব কেমন ধাবা বিবেচনা গগন? না পাবলে ব'লে দিলেই হ'ত আসতে পাববে না, তুমি ছাড়া কি ঠাকুব নেই দেশে?

আমাব মত নেই। কেমন আছ দিদিমণি?

মুখে জবাব দেবাব দবকাব নেই ব'লেই বেলাবাণী যেন নিজেকে জবাবেব মত সামনে দাঁড কবিযে বাখল। বিয়েব পব, ছেলে বিযোবাব পব, বেলাবাণী একেবাবে বদলে গেছে। বিযেব সময তাব চেহাবাটি ছিল কগ্ন বালকেব মত। সোণাব হাব অনাযাসে এদিক ওদিক দোল খেত। ছেলেটা এসে তাকে এমন কবে দিয়েছে যে দেখলে মনে হয়, এখনো সে মা হয নি, হতে চায়। ক্রমে ক্রমে পাওযাব বদলে হঠাৎ পাওয়া এই সম্পদ নিয়ে বেলাবাণী আব বাঁচে না, তাকে চটিযে দিযেও বাস্তাব লোকেব পর্য্যন্ত তাকিযে যাওযা চাই। মবণ তোমাব!—ব'লে অভিশাপ দিযে সবে যাবাব সুযোগ না পেলে মনটা খাবাপ হয়ে যায়। বাপেব বাড়ী এসেই বেলা সকলেব আগে পাড়াব চেনা মানুষদেব বাড়ী ঘুবে এসেছে, বিয়েব আগে তেবো বছবেব ছেলেব মত আঠাব বছবেব নিস্ব বেলাকে দেখে যাবা না জানি কি ভাবত। বিশেষভাবে আদর

করে বাড়ীতে ডেকে এনেছে সেই সব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সঙ্গিনীদেব, যাদের হাসাহাসি তাব রক্তকে তিতো কবে দিযেছিল। বিযেব পর, ছেলে হবার পব, গগনও তাকে আব দেখে নি। ব্যাকুল হয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে বেলাবাণী ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলছে। বুক দুবদুব কবছে বেলাবাণীব। গগনেব কি চোখ নেই? তাকে জিজ্ঞেস কবা, সে কেমন আছে। তবে হ্যাঁ, অনেক দেবীতে দেবীতে পলক পডছে বটে গগনেব চোখে, দৃষ্টি বুলিযে বুলিযে কি যেন সে মাখিয়ে দিচ্ছে সারা গায়ে, গা যাতে শিব শিব কবে।

ছবিব মত দেখাচ্ছে তোমায দিদিমণি। চাপা গলায় বেসুবা আওযাজে গগন বলল।

মবণ তোমাব! অভিশাপ দিযে হেসে বেলাবাণী ওপবে নিজেব ঘবে গেল। গগনেব একটিমাত্র বেযাদপি মাপ কববে, আগেই তাব ঠিক কবা ছিল। তাব বেশী আব কিছু নয়। এই বেশ হযেছে। গগন ভাববে, জব আমাব বাবরি চুলেব, দিদিমণি আমায ভোলে নি! ভুলেছে কিনা দেখিয়ে দেবে বেলাবাণী। এমন স্পর্দ্ধা একটা বাধুনী বামুনেব, একবাব দেখা কবতে আসে না দেড বছবেব মধ্যে, মুনিব-কন্যা তাকে মনে বেখেছে মনে কবে!

শশধবের সঙ্গে বেলাব মাও এলেন পবামর্শেব জন্য। বললেন, পাববে তো গগন? লোক কিন্তু খাবে অনেক।

সফল শিল্পীব সুবিনীত অনুদার আত্মগবিমাকে স্পষ্টতব অভিব্যক্তি দিযে গগন বলল, পবশু চিৎপুবে দু'হাজাব লোক খাইযে এলাম মা। বাবু মন ভোলা মানুষ, আগেব দিন বাত দশটায আমাব হাত চেপে ধবে' কেঁদে ফেললেন, কি হবে বাবা গগন, আয়োজন কবেছি হাজাব লোকেব, লোক যে খাবে দু'হাজাব। আমি বললাম, বাবু, আমি থাকতে ভাবছেন? মোটে হাজার লোক বেড়েছে, বলুন না আবও দু'হাজাব লোককে—

শশধব বললেন, বাইরের লোক খাবে শ' চাবেক। বিশজন বেশী ধবাই ভাল—চাব শ' কুডি জন। ঘরের লোক হবে—

বেলার মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবলেন, তুমি কি কবলে গগন? একেবাবে হাজাব লোক ভুল। কি বিপদ, মাগো!

ঝিব কোলে বেলারাণীব ছেলে। পবিপুষ্ট মধব শিশু, পেটেন্ট ফুডের বিজ্ঞাপনেব ছবিব মত। সাত আট মাসেব ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেশীক্ষণ ঘুবতে ঝি বেচাবীর বোধ হয বীতিমত কষ্ট হয।

দিব্যি পুষ্টু খোকা, মা।

ও আবাব কি কথা গগন? অমন কবে ব'লতে আছে?

আমি বললে দোষ হয না গো, মা'ঠান। আমাব বলা হ'ল গিয়ে আশীর্ব্বাদ,—বামুনের ছেলে বটি তো।

খোকাকে কোলে নিযে গগন মুখে নানাবকম আদবেব শব্দ কবে। খোকাব নতুন শেখা ফোকলা হাসি তাব লাগে বেশ। মনে হয এ যেন তাব চেনা খোকা। কোনবকম পবিচযেব ভূমিকা ছাডাই তাই একেবাবে হাসাহাসি স্বরু হযে গেছে। নাকটি একটু বোঁচা খোকনেব, ডগা বলা চলে এমন কিছু নেই। চোখেব বাইবেব কোণে স্পষ্ট ভাঁজ আব বেখা আছে। কাণেব পাতা দুটি মাথাব সঙ্গে লেপ্টানো। মনে হয যেন আঠা দিযে এঁটে দেওযা হয়েছে, আপনা থেকে গজায নি।

বেলাব মা বললেন, আট মাসে জন্মানো ছেলে। বলতে নেই, ছেলে দেখে সবাই তো অবাক। ডাক্তাব বললে, হিসেবে ভুল হযেছে, এ ছেলে দশ মাসের। কি কথা মুখপোড়া ডাক্তাবেব! মেযেব আমাব বিয়ে হ'ল দশ না এগাব মাস—

শশধব এসে পড়েছিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা। ওসব কথা থাক। কাগজ কলম আনো দিকি ফর্দ্দটা কবে ফেলি।

খোকাকে গগন তাডাতাডি কোল থেকে মেঝেতে বসিযে দিল, অস্পৃশ্যকে বর্জ্জন করাব মত। ঠোঁট ফুলিয়ে খোকা কবল কাঁদবাব উপক্রম। খোকাব চিবুকেব মাঝামাঝি একটু খাদেব মত আছে। পায়েব দু'নম্বব আঙুল দু'টিও কি একটু খাপছাড়া বকমেব বড় নয় খোকার?

কি যে তুমি কর গগন! কোল থেকে ছেলে নিলে, কোলে তো দিতে পারতে? মাটিতে নামালে কোন বিবেচনায়?

বেলার মা তাড়াতাড়ি নাতিকে কোলে তুলে নিলেন।

আড্ডা-বাসায় সে রাত্রে তাস খেলা জমল না। পিছন দেখে চিনতে পারা যায় এমন রঙচটা দাগ লাগা তাস, তাই নিয়ে খেলতে খেলতে দু'দিন আগেও পঞ্চুর সঙ্গে গগনের হাতাহাতি হয়ে গেছে। আজ সাড়ে পাঁচ আনা হেরে যাবার পর কানাই সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, ব্যাটার লেগে মন কাঁদে নাকি রে গগন? তা কি করবি বল, এ্যারে কয় কপাল। তোর ব্যাটা বাপ বলবে অন্যকে।

গুম খাওয়া গগন বলল, থুক্। ছুঁতে ঘেন্না করে, মন কাঁদবে। আগে জানলে কি কোলে নিতাম? আমার হোক, যার হোক, বেজন্মা বটে তো। বামুনের ছেলে, ঘেয়ো কুত্তার গা চাটবে তো বেজন্মার ছায়া মাড়াবে না। শাস্তরে আছে।

জীবনে প্রথম আসল রক্তে খাঁটি আগুন ধ'রে যাওয়ায় গগন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিয়ের আগে তার রক্তকে বেলারাণী যেন শুধু দাহ্য পদার্থে পরিণত ক'রে রেখেছিল, স্ফুলিঙ্গের অভাবে আগুন ধরাতে পারে নি। এবার একেবারে মশাল ছুঁইয়ে দিয়েছে।

প্রথমে বুঝা যায় নি। বিকালে টের পাওয়া গিয়েছিল শুধু ঝাঁঝ আর কিছু নয়। তা, অমন ঝাঁঝ পথে ঘাটে কত লাগে। লক্ষ্মীও একদিন লাগিয়েছিল এবং এখনও তার জের চলেছে। কে জানত তাপের চেয়ে আগুন এত বেশী গরম।

দেবতার মত, মানুষের মত আর পশুর মত একনিষ্ঠ মতি। গত্যন্তর না থাকার সামিল দুরবস্থা। প্রথম থেকে বেলারাণী যদি এইরকম হ'ত, গগন এমন ব্যাকুল হ'ত কিনা সন্দেহ। সে হ'ত জানা কথা, একবার যা জীবনের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল আরেকবার তাই শুধু চোখে দেখা।

পাড়ায় একদিন বিয়ে হ'ল বেলারাণীর গা-জ্বালানো মোটাসোটা রূপসী একটি মেয়ের, বাসর থেকে বেলারাণী এল খালি বাড়ীতে, বিনা

ভূমিকায় আশ্রয় ক'রল মেঝেতে বিছানো গগনের ময়লা বিছানা। গগণ খানিক বুঝল, খানিক বুঝল না। সার্ট কিনে গায়ে চাপাল, চুল আঁচড়াতে লাগল সযত্নে, একদিন অন্তর কামাতে লাগল দাড়ি। নিজেকে মনে হ'তে লাগল কোন এক দিগ্বিজয়ী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। পোকায় ধরা জীবন্ত বাঁশের কঞ্চি মনে হোক, মুনিব শশধরের মেয়ে তো বেলারাণী।

কি মেজাজ সে মেয়ের, কি তেজ। একজনের দাপটে সারাটা দিন বাড়ীর মানুষ যেন তটস্থ হয়ে থেকেছে। গগনকেও সে যে রেহাই দিত তা নয়। রাত দশটায় খেতে বসেই হয় তো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে, এই ঠাকুর। এই হনুমান। কত নুন দিয়েছ ডালে?

অন্য কারো কাছে ডাল নুনকাটা লাগে নি। প্রতিবাদ জানাতে সামনে এসে থালার দিকে তাকিয়ে গগন হেসে বলেছে, পাতের নুন মেখে ফেলছ দিদিমণি।

তোমার মুণ্ডু করেছে দিদিমণি। কদ্দিন না তোমায় বলেছি মুখের ওপর জবাব দেবে না? দূর করে দেব, বজ্জাত কোথাকার।

পরদিন নিজেই দূর হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে গগন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ীর শেষ জাগা মানুটির সাড়াশব্দ শেষ হবার আগেই হয় তো এসেছে বেলারাণী। জিদ নেই, তেজ নেই, অহঙ্কার নেই—ভিখারিণীর মত।

অপরিপুষ্ট শরীরটির জন্য শুধু ভিখারিণী অভিসারিকার মত অবশ্য, অন্য বিষয়ে তার একগুঁয়েমির বিকার সে সময়েও সমান জোরালই থাকত।

সব জেগে আছে। কেউ যদি বাইরে আসে?

আসুক। কি আর হবে, জানবে। আমি ডরাই না।

তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে: আমায় তোমার পছন্দ হয়? সত্যি পছন্দ হয়? দেব গো দেবো, টাকা তোমায় দেব মাইনের তিনগুণ টাকা দেব। আগে বলো না, কেমন ধারা পছন্দ হয় আমাকে? একটুখানি? তার চেয়ে বেশী? খুব বেশী?

এক মাসের মধ্যে সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, মনিব-কন্যা যদিও রাজকন্যারই স্তরের, তবু আর ভাল লাগত না। সময়মত বেলারাণীর বিয়ে না হলে গগন হয়তো নিজে থেকেই চাকরী ছেড়ে পালাত।

ভোজের আগের দিন রাত্রেই গগন হাতা খুন্তি নিয়ে শশধরের বাড়ীতে হাজির হল। শেষরাত্রে চুলায় আগুন পড়বে। সহকারী দু'জনকেও তার সঙ্গে আনা উচিত ছিল, কতগুলি অকথ্য যুক্তি দেখিয়ে তাদের সে আড্ডা-বাসাতেই রেখে এসেছে। রাত তিনটের পঙ্কু ও কানাইকে হেঁটে এতদূর আসতে হবে দেরী তারা করবে সন্দেহ নেই। বাড়ীর সকলে অসন্তুষ্ট হল, বেলারাণী পর্য্যন্ত।

তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই ভীম।

আমি থাকতে ভাবছ দিদিমণি?

আত্মীয় পরিজন এসে পড়েছে, বাড়ী আজ রাত্রেই সরগরম। বারান্দার একদিকে সাতটি বঁটি পেতে সাতজন স্ত্রীলোক তরকারী কুটছে, ঘিরে বসে আছে আরও পাঁচ সাত জন তাদের আলাপ আলোচনায় সেখান থেকে উঠছে হাটবাজারের কলরব। বালিশ আর সতরঞ্চির বিছানা বগলে নিজের আগেকার শোবার কুটরীতে গিয়ে গগন দেখল, সেখানে চৌকী পেতে শশধরের নিজের লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিছানার পুঁটলী নামিয়ে রেখে বেলারাণীর খোঁজে সে দোতালায় গেল। অন্য সব ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ ঘুমোবে, শুধু বেলারাণীর ঘরটি বাদ পড়েছে। জামাই এসেছে অনেক দিন পরে, মস্ত ঘরের একপাশে খাটের বিছানা শুধু সে আর বেলারাণীর জন্য। খোকা ঘুমিয়ে আছে মেঝেতে, লাল মশারির নীচে।

আমি কোথায় শোব দিদিমণি?

তাও আমাকে বলে দিতে হবে? যেখানে যায়গা পাবে শোবে যাও বাবু, আজ রাতে আর আরাম করে শোয় না।

ঘুপচি টুপচি যেখানে দেবার দাও দিদিমণি, শোব কিন্তু আমি একলাটি। কেউ থাকবে না সেথা।

চাপা গলায় গগনের কথা বলার ভঙ্গিটা আবেদনের নয়। ছ'নম্বর অতি তুচ্ছ বেয়াদবিতেই বেলারাণী রাগ করবে ঠিক করে রেখেছিল। হাসি পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও রাগ দেখাতে পারল না।

তুমি তো বড় নবাব হয়েছ গগন?

রান্না ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে—

কোথাও খালি নেই। কিষণলাল আর মেজমামার চাকরটা বাইরের ঘরে শোবে, সেইখানে শোওগে।

রাত্রি আরও গভীর হয়ে এলে বেলারাণী যখন সঙ্কোচ জয় করে ঘরে গিয়ে দরজা দেবে ভাবছে, গগন সিঁড়ির মাথায় পাকড়াও করল।

আমি ছাতে গিয়ে শুলাম দিদিমণি।

হিমের মধ্যে ছাতে শোবে ?

ছাত ফাঁকা হবে। কেউ যাবে না।

ঘরের মধ্যেই চাদর গায়ে দিলে আমার বোধ হয়, খোলা ছাতে বেশ ঠাণ্ডা। কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলি আবছা হয়ে গেছে। সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে বসে একঘণ্টা গগন বিড়ি টানল। মাঝরাত্রি এতক্ষণে পার হয়ে গেছে। নীচে থেকে আর মানুষের গলা কানে আসে না। এইবার বেলারাণীর আসার সময় হয়েছে। যে কোন মুহূর্ত্তে সে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি আসাই ভাল, রাত তিনটের সময় বাড়ীর মানুষেরা আজ হয়ত আবার জাগতে আরম্ভ করবে। আধঘণ্টা পরে গগন একবার নীচে থেকে ঘুরে এল। নীচের বারান্দায় এখনো কয়েকজন অনুগ্রহপ্রার্থিনী বিধবা তরকারী কুটছে, ঘুমে ও শ্রান্তিতে মুখে তাদের কথা নাই। দোতলায় বেলারাণীর ঘরের দরজা বন্ধ।

এবার সতরঞ্চিতে শুয়ে গগন বিড়ি টানতে লাগল। উনানের আঁচ সয়ে সয়ে গায়ের চামড়া বোধ হয় বিগড়ে গেছে, সামান্য ঠাণ্ডাতেই বড় কষ্ট হতে লাগল। জ্বর এসে শীত করার মত।

রাত জেগে ঘুমিয়েছে বেলারাণী, তবু সে উঠল খুব ভোরেই। বাড়ীর প্রায় সকলেই অবশ্য তখন উঠে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে বেলারাণী নীচে নামতে না নামতে কোথা থেকে গগন এসে দাঁড়াল।

খোকা ঘুমোচ্ছে দিদিমণি তোমার খোকা ?

হ্যাঁ। কেন ?

একবারটি কোলে নিতাম ?

নিও। ঘুম ভাঙলে নিও।

শিথিল শ্রান্ত বেলারাণী হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ছিটকে সরে গেল।

খোপ ডুবন্ত কাপড়ে মালকোঁচা এঁটে, কোমরে গামছা বেঁধে, বাবরি চুল সামলাতে মাথায় একটুকরো লাল সালুর ফেটি জড়িয়ে গগন প্রকাণ্ড হাতা দিয়ে ডেকচির ভেতরটা নাড়তে থাকে, চেনা মানুষ কাছে এসে খাতির করে বলে, কেমন আছ গগন?

হাতা খুন্তি নাড়া চাড়া সুরু করেই গগনের মুখে সফল শিল্পীর অনুদার আত্মগরিমার ছাপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সহকারী পঞ্চু ও কানাই উঠছে বসছে তারই হুকুমে। পঞ্চু বয়সে বড়, একটু রোগা এবং বাঁকা, কপালে তোলা গাঁজাখোরের চোখ, নেশা কিন্তু তার দেশী মদের। কানাই-এর বাড় কিশোর বয়সেই বন্ধ হয়ে গেছে, মুখের ক্ষেতে গোঁপদাড়ির ফসলে তার দারুণ অজন্মার লক্ষণ। গগনের প্রতিভাগত অসংযমের সঙ্কট কিন্তু সেই সামলে চলে। মাঝে মাঝে গগনের ঝোঁক চাপে পুরাণো খাদ্যে নতুনত্ব আনবে, এমন স্বাদ সৃষ্টি করবে মানুষের জিভ যার পরিচয় জানে না। হঠাৎ-জাগা উৎসাহে ও উল্লাসে একটানে হাতের বিড়িটা চড়চড় শব্দে আধখানা পুড়িয়ে সে বলে · খেয়ে যদি সবাই পাত না চাটেরে কানাই, বাপ আমায় জন্মো দেয় নি।

কানাই তখন সৃষ্টি-পূর্ব্ব সমালোচকের মত মাথা নেড়ে বলে, উহুঁক। সেটি হবার নয়। কালিয়া যদি না কালিয়া হবে তো গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।

গগন তা জানে, অভিজ্ঞতাও আছে। কেবল মনে থাকে না। খাবে অন্য লোকে, উপভোগ তাদের বলে পছন্দ অপছন্দের অধিকারটাও তাদেরই, তবু তাদের বৈচিত্র্য পরিবেশনের সুযোগ না পেলে সব যেন কেমন একঘেয়ে মনে হয় গগনের। কখনো সে মুষড়ে যায়, কখনো রাগের জ্বালায় থুক্ করে থুথু ফেলে দেয় মাছ তরকারীর পাত্রে।

বলে, স্বাদ হবে।

কোনের ছোট উনুনে বেলারাণীর মাসী পায়েস রাঁধতে এলেন, খোকার মুখে দেবার পায়েস। সঙ্গে এল বেলারাণী। ইতি মধ্যে আরেকবার কাপড়

বদলে সে তাঁতেব কোবা কাপড পবেছে, সাবান মেখে কবেছে স্নান। বান্নাব গন্ধ পর্য্যন্ত ছাপিযে উঠেছে তাব গায়েব তেল সাবানেব গন্ধ।

মন দিয়ে বেঁধো গগন। বান্না ভাল হলে আমি তোমায একটাকা বখশিস দেব।

ঘণ্টাখানেক পবে আবেকবাব সে এল। একা।

কি কি নামালে গগন? পোলাযেব বঙ তো খোলেনি। জাফবান দাওনি বুঝি? বললাম যে দিতে?

চাবিদিকে একনজব তাকিযে——

এত আগে বেগুন ভেজে বাখলে কেন?

বিয়েব আগে দিনেব বেলাব দাপটেব সঙ্গে তাব আজকেব কর্ত্তালিব তুলনাও চলে না, কিন্তু সে দাপটেব ধবণ ছিল ভিন্ন। চিবিযে চিবিযে গা-জ্বালানো কথা বলাব কাযদাটা সে বিযেব পব আযত্ত্ব কবেছে। সে চলে গেলে গগন বলল, শুনলি কানাই? দেমাক দেখলি?

বন্ধুব বদলে কানাই কিন্তু বেলাবাণীকেই সমর্থন কবল। তা, দেমাক ভাই কবতে পাবে।

গগন কথাটি না বলে নুনেব পাত্র হাতে তুলে নিল। কানাই তাকে চিবদিন সামলে এসেছে, আজ ঝোঁকটা কোন দিকে থেকে এল ঠিক ধবতে না পাবায তাব ক্ষমতায কুলিযে উঠল না। হতভম্বেব মত সে শুধু জিজ্ঞাসা কবতে লাগল, ওকি হচ্ছে? ওকি কবছিস গগন?

ছোট ছেলেমেয়েবা খেতে বসল আগে। বেগুণ ভাজা ছাড়া সব কিছুই নুন কাটা, মুখে দেওযা যায না। বেগুণ ভাজায় নুন ছড়িযে দিতে গগনেব খেযাল ছিল না।

শান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজনা পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন অনেক, সে গান ছড়িয়ে পড়েছেও খুব। হিন্দুস্থানী গানের তুলনায় নিশ্চয় তেমন কঠিন ব্যাপার নয় তাই সহজেই লোকে এ গানের সুর কণ্ঠে ধারণ করতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু এ গান সহজেই গাওয়া যায় তখন এধরণের গান রচনা করাও তেমন কঠিন নয়। কিন্তু সে ধারণা ভুল। কেননা, যেমন ইচ্ছা সুর বসালে তো চল্‌বেনা। কবিতার ভাবে, ছন্দে, ও রাগিণীতে মিলে একটি অখণ্ড রূপ দেখাতে হবেই, তবে হবে সে গান স্বার্থক। আজকালকার আধুনিক সঙ্গীত নামে যে গানের চলন দেখছি, তা থেকে অনুমান করতে পারি যে, এই আধুনিক রচয়িতারা হয়তো মনে করেন রাবীন্দ্রিক ঢংএ সুর যোজনার দ্বারা গান তৈরী করা খুবই সহজ। এর জন্য শক্তির বা সাধনার খুব প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় একমাত্র বাইরে থেকে গানের সুরেই সকলে জানে, কিন্তু কজন আমরা জানি, এপথে তাঁর জীবনকে পূর্ণ করে তুল্‌তে, তাঁকে কত ভাবে সাধনা করতে হয়েছে। কত গান তাঁকে শুন্‌তে হয়েছে। কতদিক থেকে সুর ও ঢং আহরণ করতে হয়েছে তাঁর গানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে। কত রকমের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে গান রচনার পথে। তিনি ছিলেন শক্তিমান পুরুষ, তাই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বাধা পাননি। আজ এই লেখার ভিতর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে রবীন্দ্রনাথ কত রকমে গানে সুর যোজনা করতেন, এবং কত রকমের গানের ঢং ও সুরের অনুকরণ করে নিজেকে তৈরী করেছেন ও তাঁর গানের ভাণ্ডারে বৈচিত্র্য এনেছেন। কোন বিশেষ এক গণ্ডি ধরেই বসে ছিলেন না।

চলতিপ্রথা মত আগে কথা ও পরে সুর যোজনা করাই রীতি। এভাবেই তিনি বেশী গান রচনা করেছেন। রচনার পূর্বে তিনি ভেবে নিতেন কোন

রাগিণীটি বা সুরটি গানের মূল ভাবের সঙ্গে খাপ খাবে পরে সেই রাগিণীতে বা সুরে আলাপের মত সুর ভেজে নিয়ে, বা সেই সুরের কোন একটি আগের দিনের শেখা হিন্দি গান বা অন্য কোন গান গলায় আওড়ে, তার রূপটি অন্তরে ধরতেন ; তার পরে সুরু করতেন গানের সুর যোজনার পালা। কোন বিশেষ গানকে ভেবে নিজের গানের সুর যোজনা যে করতেন তার পরিচয় পাবো রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত গানের খাতাগুলিতে। বহুপাতায় বাংলা গানের সুর যে গান থেকে আহরণ করেছেন তার প্রথম পংক্তিটি গানের মাথায় লেখা আছে। আগের দিনের গান রচনায় এভাবে কোন পরিচয় রেখে যাননি। শেষ জীবনেই দেখলাম বেশী। এই ভাবে লেখার কারণ হোলো—গান রচনা করার পর একবার অন্যদিকে মন গেলেই প্রায়ই সুর হারিয়ে ফেলতেন। এক এক সময় এমন হোতো যে রাগিণীটিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতেন। কিছুতেই মনে আনতে পারতেন না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মূল গানটি উপরে লিখে রেখে নিজেকে সাবধান করে রাখতেন। কিন্তু মুস্কিল হোতো যখন গানের সুর এক রাগিণীতে আরম্ভ করার পর অন্য পথে চলে যেতো। সে সময় তার খেয়ালই থাকতো না কিভাবে কোন রাগিণীতে কি হচ্ছে। সম্পূর্ণ তৈরী করে শিখিয়ে দিয়ে তখন বিচার করতে বসতেন কি হোলো, কোন রাগিণীর সঙ্গে মিশল।

অনেক সময় অকারণ আনন্দে তার অন্তরে সুরের প্রেরণা জেগেছে আগে, কথা জুড়েছেন পড়ে। ছিন্নপত্রে এরকমের একটি বর্ণনা পাই, তাতে লিখেছেন "এই শৈবাল বিকীর্ণ 'সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রে আমি জানালার কাছে এক চৌকীতে বসে আর এক চৌকীতে পা দিয়ে, সমস্ত বেলা কেবল গুন গুন করে গান করছি। রামকেলী প্রভৃতি সকাল বেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবা মাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্র। আমার এই গুন গুন গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই। এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমেছে এবং কত বিসর্জ্জন দিচ্ছি। আজ

সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা রামকেলীতে যে গোটা দুই তিন ছত্র বার বার আবৃত্তি করেছিলুম সেটুকু মনে আছে, নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করে দিলুম,—"ওগো তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে"। এই গানটি পরে গীতাঞ্জলীতে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। "চিত্রাঙ্গদা" গীতিনাট্য রচনা নিয়ে যখন তিনি মেতে আছেন, সেই সময় একদিন অতি প্রত্যুষে ডাক্ পড়লো। সচরাচর এত সকালে তিনি ডাক্‌তেন না। গিয়ে দেখি তখনো তাঁর সকালের খাওয়া শেষ হয়নি। বল্লেন, একটি গান তার মাথায় হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মাঝ রাতে এসেছিলো, কিন্তু সেই যে ঘুম ভাঙ্গলো আর সারারাত ঘুমোতে পারেন নি। গানের সুর ও অমার্জ্জিত তার ভাষা নিয়ে সারারাত কাটালেন। সকালে বিছানা ত্যাগ করে তার পরে কাগজে কলমে তাকে লিখেছেন। দুঃখ করে বলেছিলেন, রাত্রে গানটি তাঁর মাথায় বেশ পরিষ্কার ছিল, সকালে নানা বাধায় একটু এদিক ওদিক হয়েছে সুরে।

স্নানের ঘরে গানের প্রেরণাও রবীন্দ্রনাথের মনে জাগে এরকমের কথা শুন্‌লে অনেকেরই হয়তো মনে হাসির উদ্রেক করতে পারে, কারণ তাঁর মত কবির পক্ষে স্নানের ঘরে গানের প্রেরণা জাগাটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তাও হয়েছে। "ছিন্নপত্রে" সেই বিষয়ের অবতারণা করে তার কারণ ও বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বলেছেন,—"ও গানটা আমি স্নানের ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করেছিলুম। স্নানের ঘরে গান তৈরী করবার ভারি কতগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোন কর্ত্তব্যের কোন দাবী থাকে না। মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন গুন করলে কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না, সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোন দর্শক-সম্ভাবনা না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরী করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তি তর্কের কাজ নয়। নিছক ক্ষিপ্ত ভাব।"

স্নানের ঘরে তাঁকে গান গাইতে অনেকেই হয়তো শুনেছেন, আমার নিজের শোনা একটি দিনের কথা আজ এখানে উল্লেখ করতে পারি।

সিংহলে ১৯৩৪ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা নৃত্যগীত উপলক্ষে ভ্রমণে যাই তখন প্রায়ই একই বাড়ীতে আমরা সকলে থাকতাম। একদিন সকালে স্নানের সময় শুনেছি তিনি প্রাণ খুলে সকালের রাগরাগিণীতে আলাপের মত বিনাকথার সুরে গান গেয়েই চলেছেন। বহুক্ষণ এভাবে তিনি সময় কাটিয়েছিলেন।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত পিয়ানোর গতের সুরে গান রচনা করেছেন। অর্থাৎ পিয়ানো যন্ত্রের রাগরাগিণী যে ভাবে ছন্দে বাজতো, তার সঙ্গে মিল রেখে তিনি কথা বসিয়েছেন। "মায়ার খেলা-র" সঙ্গে যুক্ত "দোলা সখী দে পরায়ে দে গলে" গানটি তার একটি উদাহরণ। এরকম যতগুলি গান আছে, সে সবের সঙ্গে পরবর্ত্তী জীবনের গানের তুলনা করা চলেনা, ভাবে, ভাষায় ও রচনায়।

তার পরে দেখেছি হিন্দিগানের সাহায্যে ধর্ম্মসঙ্গীত ও বাল্মীকী প্রতিভায় গান রচনা করতে। বিশেষ করে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ প্রথায় বেশীর ভাগ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করার পর, উপরোক্ত পদ্ধতিতে সঙ্গীত রচনা করতে দেখলাম খুব কম। তার কারণ, কলকাতার বাড়ীর ওস্তাদদের গানের মজলিসে যোগদান করবার অবসর তখন তাঁর ছিল না। এবং প্রকৃতপক্ষে এ জীবনেই তাঁর ভিতরে গানে সত্যিকার মুক্তির পরিচয় ফুটে উঠতে সুরু করেছে বলেই তার পর থেকে শান্তিনিকেতনে এসে অন্য গানের সাহায্যে গান রচনা করবার খুব প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি, তাই আগের দিনের তুলনায় অন্যের উপর নির্ভর করা অতি অল্প গানই এ জীবনে আমরা রচনা করতে দেখলাম।

এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি ভাঙ্গা বাংলা গানের মূল হিন্দি গান বা অন্য সব গানগুলি কি? আজকের দিনে সব গানের কথা বলা সম্ভব নয়। এবং সব দেবার কোন প্রয়োজনও নেই। তবুও কতকগুলি গানের বিষয়ে উল্লেখ করে আজ এই আগ্রহ মেটাতে চেষ্টা করবো। হিন্দি গানের কাব্যসম্পদ সাধারণত উৎকৃষ্ট নয় বলে রবীন্দ্রনাথের মত কবি সে গান ভেঙ্গে বাংলা গান রচনা কালে, তার

সুর ও ছন্দ সম্পদকেই গ্রহণ করেছেন। কথার প্রতি কোন নজর দেননি। তিনি নিজের মনের আবেগে হিন্দি গানের সুর ও ছন্দকে বজায় রেখে পৃথক ভাবের কথা তাতে জুড়েছেন। এ রকমের গানের সংখ্যা তাঁর সব চেয়ে বেশী, গানগুলি প্রায়ই ধর্ম্মসঙ্গীত। অন্যান্য গানও আছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে "আডানা" রাগিণীতে একটি প্রচলিত গান আছে, তার নাম অনেকেই শুনে থাক্‌বেন, এবং পণ্ডিত মহলে এখনো আদরের সঙ্গে গানটি গাওয়া হয়। এর নাম হোলো "মন্দিরে মম কে আসিল হে"। হিন্দি ভাষার

"সুন্দর লাগোরী হৈ পিয়রবা,
চঞ্চল চপল চখন লখন
দোরে দোরে মোরে মোরে
ফির মুস্‌কানী বাণী॥" ইত্যাদি।

এই গানটি থেকে উপরোক্ত বাংলা গানটি রচনার প্রেরণা তাঁর মনে এসেছিল। "ছেলে বেলা" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ কাফি রাগিণীর ধ্রুপদ

"রুন ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া পিয়া বিদেশ মোরি"
থর থর ছতিয়া ন নিশ দিন মন ভাবে।
নৈন নীঁদ আবে দামিনী দমক লাগে
উনবিন কওন পরত নাথ নাথ ধাবে।"

গানটির উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর বর্ষার গীতকুঞ্জে এই সুরটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ গানটি তিনি বর্ষাসঙ্গীতে পরিণত করেন নি বলেই আমার বিশ্বাস, করেছেন একটি উপাসনার গীত। গানটি হোলো,—

"শূন্য হাতে ফিরিয়ে, নাথ পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চির-ভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে॥' ইত্যাদি॥

বাংলায় কোন বর্ষার গান না পেয়ে এবিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে হয়তো ভুল করেছেন, তাঁর খেয়াল ছিলনা। পরে সংশোধন করে দেবেন এই কথা প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজনা পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথের কিছু বাংলা গানের আরম্ভে যদিও হিন্দি গানের সঙ্গে ভাবের একটু মিল দেখি, কিন্তু পরের অংশে সেই গানের ভাব অন্য পথ ধরেছে।

'মুরলীধ্বনি শুনি অরি যাই যমুনাতীরে"
তরসোঁ হমতনমন যোবন সোঁ বিকাই।"

গানটি সিন্ধু রাগিণীর। এরই থেকে বাংলা গান রচনা হোলো, "চরণধ্বনি শুনি তব নাথ জীবন তীরে।" "মুররলীধ্বনি" ও "যমুনাতীর" কথা দুটি বদলে "চরণধ্বনি," ও "জীবনতীর" হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পংক্তিতে একটু ভাব-গত মিল পেলাম। অন্য পংক্তিগুলি একেবারে আলাদা পথে গেছে। ভৈরোঁ রাগে, "মন জাগো মঙ্গল লোকে" উপাসনার গানটি রচিত হয়েছিল হিন্দি

"জাগো মোহন প্যারে,
সাঁবরী সুরত মোরে মন ভাবে
সুন্দর লাল হমারে।"

গানটির অনুকরণ করে।

ভাবের দিক থেকে প্রায় সব গানটিই মেলে, এ রকমের হিন্দি গান বেশী না থাক্‌লেও একেবারে নেই একথা বলা চলেনা। যত গান আছে, তা দেখে মনে হয় হিন্দি গানের ভাষাও অনেক সময় তাঁকে প্রেরণা জাগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই গাইতে শুনেছি বেহাগ রাগিণীর হিন্দি গান,

"ক্যায়সে কাটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা
একেলি জাগি সজনি আজু মোরা
নয়নমে নিদন আওয়ে ছোঁড়ি সৈয়াঁ॥"

এর উপরে নির্ভর করে বহুবৎসর পূর্ব্বে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত লিখলেন, "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে শূন্য জীবনে, জীর্ণ ভবনে।" বছর আট পূর্ব্বে যখন "তাসের দেশ" লিখ্‌লেন তখনো দেখলাম ঐ গানটিকে আবার অনুসরণ করলেন,

'হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে
কোন সে নিরুদ্দেশ লাগি আছ জাগিয়া।" ইত্যাদি

প্রাচীন রচয়িতা "জানকীদাস" রচনা করেছিলেন বর্ষার গান,—

প্রচণ্ড গর্জ্জন সজল বরষা ঋতু
কাম অগম অত বিরহিণী জীয়ণ তর্জ্জন।
ঝট অদ দামিনী মতঙ্গসম যামিনী।
অবক্রম চাপ কর্কশ বুঁদ বারি বরষন। ইত্যাদি।

এই গানটি অবলম্বন করে বাংলাভাষায় চমৎকার বর্ষার গান রচিত হোলো,—

"প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দ্দিন
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনী তর্জ্জন
ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গ ক্ষত যামিনী
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ॥"

ভানুসিংহের পত্রাবলীতে, তার অত্যন্ত স্নেহের, রাণুদেবীকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন,—"আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" এই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মত স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে,—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাক্‌বে-যে বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবেনা" এ গানটি যে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় গান ছিল সেকথা উপরের মন্তব্যতেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, আমি তাঁকে বহুবার এ গানে মগ্ন হতে দেখেছি। বাংলা কথা সম্পূর্ণ এখানে তুলে দিয়ে তার পরে হিন্দি গানটিও সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি। বাংলা গানটি হোলো,—

"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে॥"

কথা হোলো,—

'বীণ বাজায়রে মন লে গয়ো।
মধুর মধুর ধুন অধর ন ধররে
রস ভরি তান শুনায়রে মন লে গয়ো॥"

হিন্দি মার্গ সঙ্গীত যে সর্ব্বত্রই কাব্যরস বিহীন একথা মনে করতে বাধে যখন দেখি উপরের এই হিন্দি গানের মত অনেক হিন্দি গান আছে, যার কাছে ভাবের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ আহরণ করতে কুণ্ঠিত হননি।

হিন্দিতে তেলেনা গান কাকে বলে তা আমরা জানি, নটমল্লার রাগের তেলেনা গান,—

দাবাদীম্ দাবদীম্ দারাদীম্ দাবা তাদারে দানি দানি
তানা নাদেরে দের্ তোম্ তানানা তানা
তোমদের তদারে।"

এর সুর ও ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে গান বেঁধেছিলেন, "সুখহীন, নিশিদিন পরাধীন হয়ে" ব্রহ্মসঙ্গীতটি। বাল্মিকী প্রতিভাতে ইমনকল্যাণে একটি গান আছে "এই বেলা সবে মিলে চলহো" এই গানটি হিন্দি চতুরঙ্গের গান,

"চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো গায়ন গুণী আয়ে
মহম্মদশাকে সব, কাজ হস্তী তুরঙ্গ সরস সুখ পায়ে,

থেকে সংগ্রহ করা।

কয়েক বৎসর পূর্বে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে দুটি সেতারের গৎভাঙ্গা গান রচনা করলেন। প্রথমটি হোলো "এস শ্যামল সুন্দর" অপরটি "গোর ভাবনারে কি হাওয়া মাতালো"। এই দুটি গতের ছন্দে মিলিয়ে কথা বসিয়েছেন।

দক্ষিণ ভারতের গানের সুর যে তাঁর মন আকর্ষণ করেছিল, সে কথারও পরিচয় পাই সেই ঢংএর বাংলা গানে। শান্তিনিকেতন বাসের বহুপূর্বে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সংগৃহীত মাদ্রাজী সুরের একটী গান আছে তার প্রথম লাইন হোলো "একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে"। ১৩৩৭ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী সুগায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে তাদের দেশের কয়েকটি সুর তার মন আকর্ষণ করে।

"বাসন্তী হে ভুবন মনমোহিনী'
"বেদনা কি ভাষায় রে"
"বাজে করুণ সুরে'
"নীলাঞ্জন ছায়া"।

গান কটি আমরা তারই ফলে পেয়েছি। প্রথম গানটি হোলো "মিনাক্ষী' দেবীর একটি বিখ্যাত বন্দনা গান থেকে রচনা। 'নিন্নু চরণ মূলে, বামা" নামে গানটি থেকে তৈরী হোলো "বাজে করুণ সুরে"। "বৃন্দাবন লোলা"

নামে একটি গান ভেঙ্গে হয়েছে, "নীলাঞ্জন ছায়া" গানটি। ঠুংরী চালের অনুকরণে একটি গানের কথা মনে পড়ছে, "খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো গেল যে খেলার বেলা"। এ গানটি লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের একটি প্রচলিত ঠুংরী গান সুগায়িকা সাহানা দেবীর মুখে শুনে রচনা করেছিলেন, কথাগুলি স্মরণ নেই। "তুমি কিছু দিয়ে যাও" ও ঠুংরী চালের, "কৈ কছু কহবো" গান থেকে তৈরী। সুরটি সাবিত্রী দেবীর কাছে শোনা। আর একটি, মীরা বাঈয়ের নামে চলিত ভজনও তার কাছে শুনে বাংলায় তাকে রূপান্তরিত করেন।

"কখন দিলে পরায়ে স্বপনে
বরণ মালা ব্যথার মালা"

গানটি সেই ভাবে তৈরী। মূল হিন্দি কথা ছিল

"বিছে দেখা বানহাইয়া
প্যারা কি বনশীবালা,
(বনশীবালা মুরলীবালা)

মূল সুরটি ছিল ভৈরবী, কিন্তু সুরে ও ছন্দে লঘুচপলতার প্রকাশ ছিল বলে পরে সুর বদলে দিলেন, এখন গানটি পিলু রাগিণী ও ঢিমা লয়ে আমরা গাই।

শিখদের বিখ্যাত দোঁহা "বাদে বাদে রম্য বীণ বাদে" শুনে ভাষায় ভাবে ঠিক রেখে, গান রচনা করেছিলেন "বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে"। গুজরাতী ভজন ভেঙ্গে গান রচনা করলেন "একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি, বুঝি পিতা তাকে ছেড়ে গেছ তুমি"। মারাঠি থেকে হোলো "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে" গানটি। "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" গানটি মহিশূরের ভজন গান ভেঙ্গে রচনা।

বাংলা দেশের গানের মধ্যে, বাউল সুরের কিছু গানের উল্লেখ করে দেখাবো যে বাউল গানের রূপকে কিভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। এখানে আমি কেবলমাত্র গোটা কয়েক বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীতের কথাই উল্লেখ করবো। "যদি তোর ডাক শুনে না আসে" গানটি তিনি পেয়েছেন,—

"হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই
আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই।
আমার নিতাই যদি, (ডাকরে নিতাই গৌর বল)
যদি মনে করে, তবে গৌর দিলেই দিতে পারে
একলা নিতাই (ও নিতাই) ।"

গানটি থেকে। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি তিনি রচনা করেছেন, "গগনহরকরা"-র রচনা,—

"আমি কোথায় পাব তারে আমার
মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দিশে দেশ বিদেশে
আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

গানটি দেখে। আর একটি গান আছে,—

"মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী
ভবনদীর তুফান ভারি।
তোর হেলে পেলে না জল, কি করবি বল
কেমনে জমাবি পাড়ি।" ইত্যাদি

এই গানটিকে ভেঙ্গে রচনা করেছেন,—

"এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসাই তরী"

গান রচনা তাকে আরো কত অদ্ভুত রকমে করাত হয়েছে সে কথাও এখানে বলা ভালো। শান্তিনিকেতনের নাচে, আগে গান রচনা হয়েছে নাচ যুক্ত হয়েছে তার পরে। কিন্তু নাচের চর্চা যতই বাড়তে লাগলো, ছেলে মেয়েদের নাচের ছন্দের নানা রকমের উৎকর্ষ দেখা দিল, কেবল বোলের তালের সেই সব নাচ দেখে, তিনি সেই ছন্দ কথা বসিয়েছেন গানটিকে নাচে আরো জমাট করবার ইচ্ছায়। "চণ্ডালিকা" নাটকের একটি দক্ষিণী তালের নাচের কথা ভেবে "আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা" গানটি লিখেছিলেন। নাচের তালে যে তেহাই পড়ে তাকেও মিলিয়ে দিলেন "আয় তোরা আয়" কথাটিকে তিনবার গাইয়ে। এ সব

গানগুলি তাঁর সামনে আমি আওড়ে গেছি, তিনি সেই শব্দ ঝংকারে মিলিয়ে গান বেঁধেছেন। সিংহলের ক্যান্ডি নাচের তালের বোলের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় আর একটি গান বাঁধলেন, "যে আমারে এনেছে এই অপমানের অন্ধকারে" এ রকমের আরো একটি গান আছে এই প্রথায় তৈরী।

এই বিচিত্র প্রথায় গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা যে একটুও খর্ব্ব হয়েছে তা মনে হয় না, অতি বাজে কথার গানকে খুব উঁচুতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে কবিতা লেখাটা এত সহজ ছিল যে, উপরোক্ত এই নীরস প্রথায় কবিতা লিখেও কবিতাগুলি কাব্যে স্থান পেয়েছে। তবে এ রকম গানের যে ছন্দ পতন হয়েছে সুর ছাড়া পাঠ করলে তা বোঝা যায়।

বিদেশী গানের প্রভাব রবীন্দ্র সঙ্গীতে আছে জানি। সে গানের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা গান এক জীবনে কিছু রচনা করেছিলেন। "সকলি ফুরালো যামিনী পোহাইল" গানটি "Robin Adir" নামে একটি Scotch গান থেকে নেওয়া। "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়" গানে সুর দিলেন,—"Ye banks and braes of Bonie Doon" নামে বিখ্যাত Scotch গান থেকে। কাল মৃগয়ার, "তুই আয়রে কাছে আয়, আমি তোরে সাজিয়ে দিই" ও বাল্মীকিপ্রতিভার "কালী কালী বলো রে আজ" গান দুটির সুর ক্রমান্বয়ে "Ye Mariners of England" এবং "Nancy Lee" থেকে নেওয়া।

গানের এই তালিকা থেকে সাধারণ ভাবে দেখলে একটা কথা মনে না হয়েই যায় না যে গানে তিনি আশ্চর্য্য রকমের উদার মনোভাব দেখিয়েছেন। এটি তার পরিবারেরই একটি বিশেষ সম্পদ। ধ্রুপদের আওতায় বড় হয়েছেন বটে, খেয়াল গানও গেয়েছেন, আবার অনেক টপ্পা গান তাকে শুনতে হয়েছে তারই মধ্যে, এবং সে গানে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন। রচনা করেছেন অনেক গান এ ঢংএ। তাতে বাধা হয়নি। ঠুংরী, তেলেনা, বাউল, কীর্ত্তন ইত্যাদি নানা গান বেঁধেছেন কোনটাই বাদ পড়েনি, যেখানে যেটা ভালো লেগেছে তাকেই আহরণ

করে বাংলার সুর সম্পদকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন। নিজেরও সুরের অভিজ্ঞতা বেড়েছে তাতে।

এত বিচিত্র পদ্ধতির সঙ্গীতের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাকে পাকা করে তবে তিনি পেরেছিলেন এতখানি বড় রচয়িতা হতে। তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল কিন্তু তার পিছনে যে সাধনার পরিচয় পাই সেটিকে আমাদের বিচার করতে হবে। এতখানি সাধনা ছিল বলে তিনি সঙ্গীতে নবযুগের সূচনা করতে পেরেছেন।

শওকত ওসমান

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বিদগ্ধ-সমাজে খ্যাত পণ্ডিত। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর বাংলা সাহিত্যের এক প্রাচীন যুগের অবসান হয়। তাঁর সাহিত্যিক সম্পত্তির মালিকানা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী অন্যতম। সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল এ্যাকাডেমি গঠনে দু-জনেরই নিরঙ্কুশ সায় ছিল। গত শতাব্দীর প্রত্যেকটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের বিকাশ 'প্রভাকরে'র কেন্দ্রে। গুপ্ত-কবিই বঙ্কিমচন্দ্র-কে পদ্য-লেখার পরিবর্তে গদ্য-লেখায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক-সৃষ্টির এই দিব্য-জ্ঞান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটী অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনা একমাত্র শানের পাথর—যা কর্তন-ক্ষমতা বিতরণ করে কিন্তু নিজে কাটে না। সাফল্যে দ্বিধান্বিত 'সবুজ-পত্র' প্রভাকরেরই দূর দরিদ্র আত্মীয়।

বীরবলের অন্য-একটী ঐতিহ্য-গত অধমর্ণতা গুপ্ত-কবির শব্দ-প্রয়োগ-কৌশলের উত্তরাধিকার অনুপ্রাস ও যমকের ব্যবহার। প্রমথ বাবুর ভাষার চোরা চাবিকাঠি অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্য্য কখন পাশাপাশি শব্দের হেরফেরে, কখনও একই বাক্য (sentence)-এর ওলট-পালট সাজ-সজ্জায়। হালফিল ঘটনা ছুঁয়ে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন ব্যঙ্গ-কবিতা, প্রমথ চৌধুরী তাঁর কারিগরী ফলিয়েছেন প্রবন্ধে, দু-জনের ব্যঙ্গেই ইস্পাত সমান। অবিশ্যি গুপ্ত-কবির শৈল্পিক দক্ষতা বীরবলে একান্ত বিরল।

চলতি গদ্যের তিনি স্রষ্টা, নূতন ঢঙের প্রবর্তক ইত্যাদি মুখরব ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণার অজস্র একদল চেলা-চমূ গলা কাটিয়ে জাহির করে। এই ঢক্কা-বাদকদের অনুরোধ, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম' ও প্রমথ চৌধুরীর যে কোন প্রবন্ধ তাঁরা যেন পাশাপাশি রেখে পড়েন। বাংলা গদ্যের কি সামান্যতম উন্নতি বীরবলের বলে সাধিত, তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। 'হুতোমে'র ভাষার উপর একপোঁচ একটু মার্জিত প্রলেপ,

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য। কালীপ্রসন্নের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ততটা ছিল না, তাই তাঁর গদ্যে স্বদেশী-কৃত বিলাতী শব্দ কম, বিষয়বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। প্রবন্ধের উপাদান গদ্য-শৈলীর গতি-নিয়ন্ত্রণে সিন্দবাদ কাহিনীর বৃদ্ধেরই অনুরূপ। কালীপ্রসন্নের বাহন মজবুত কেবল আরোহী তাল-পত্রে গড়া। কিন্তু সংলাপী রচনা-শৈলীর সমস্ত সদ্‌গুণ সেখানে উপস্থিত। উনিশ শতকের ইংরেজীয়ানা প্রদীপ্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-নিচয় কি হাল্কা নয়? ল্যামের প্রবন্ধও লঘু। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব কম নয় কোথাও। বীরবলী প্রবন্ধ ও তৎরচয়িতা—দুই-ই হাল্কা। সহৃদয় কল্প-প্রীতি (fancy)-র দীনতায় প্রমথবাবুর কোন প্রবন্ধ জাতে উঠে নি। বৈহাসিকতার জঠরেই তাদের অপমৃত্যু। চলতি ভাষার দুর্বলতা যে অনেক, তার জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট. আঙ্গুল বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রমথ-বাবুকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের নোটিশ, সুধীজনের স্মৃতিতে নিশ্চয় এখনও জাগরূক। "গড়া সামলানো মুস্কিল হয়। স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথের এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ প্রমথ চৌধুরীর কার্য্যাবলীর সুষ্ঠু সমালোচনা। কোন কিছু sublime এই চলতি ভাষায় লেখা চলে না, আপাতঃ কাউকে লিখতে দেখছি না। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা,' 'সংকলন' গ্রন্থের অনেক গদ্যাংশ, জাতীয় রচনা চলতি গদ্যে লেখা প্রায় অসম্ভব। কবিগুরু পরবর্তী কালে তেমন লেখায় হাত বাড়াননি। এই দিকে সতর্কতার চোখ রেখেই সাধু ও চলতি ভাষার প্রসঙ্গে তিনি ছ-বছর আগে লিখেছিলেন, "আমার ভাষা রাজাসন ও রাখালী, মথুরা ও বৃন্দাবন, কোনটার উপর সম্পূর্ণ দাবী ছাড়ে নাই।" বর্তমান দিনের হাল্কা প্রবন্ধ রচয়িতারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন চলতি ভাষায় প্রবন্ধ লেখার বিপদ, এবং যার জন্য রসিক ও লেখক পদে পদে বিড়ম্বিত—ও, এ, তা, যে, সে, তো (ই, ও, দিয়ে সুর-সঙ্গতি রক্ষা, যা বার বার করতে হয়) ইত্যাদি অব্যয় অব্যয়ানুরূপ শব্দগুলির পুনরুক্তি বাহুল্য। শ্রীযুক্ত চৌধুরীতে তার মিছিল সর্বত্র দেখা যায়। বীরবলের প্রবন্ধ ও গল্প দাঁড়ি পাল্লার দুইদিকে সমান। এরা চলে কিন্তু কিছু বলে না। "আমাদের

নামে এই অপবাদ ছিল যে বাঙালী রসনা সর্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই তো রচনা সর্বস্ব।" বীরবলের এই উক্তি (নানা কথা দ্রষ্টব্য) ঢেলে সাজাই সঙ্গত। তিনি রসনা-সর্বস্ব, 'রচনা-সর্বস্ব নন। বলার চেয়ে বিবক্ষার ঝোঁকই তাঁর বেশী। যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না, সে ঘণ্টা নাড়ে বেশী—এতো চিরদিনই সত্য।

চৌদ্দলাইনের সলিতা লাগা হেতু একরকম দেওয়ানগীর বাতির নাম চৌদ্দলাইনের বাতি। প্রমথ বাবুর সনেট ফাঁপা। ও গুলো চৌদ্দলাইনের বাতিক বলাই বিধেয়।

বুদ্ধি-গৌরবে স্ফীত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নতুন আলোর ঝলমল, বিদগ্ধ প্রমথ চৌধুরী—তবু তাঁর রচনায় এমন পেসিমিজমের ছায়া। কমলাকান্তের দপ্তর আমাদের সমাজ-জীবনের দুর্বলতার উপরই কশাঘাত। যে পুঁথির চারিধারে হেমন্তের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ আর পৃথিবী, বাতাসের ভাণ্ডারের নবীন নিঃশ্বাস, সেখানে প্রমথ চৌধুরীর পেঁচকের কোটর-কীর্তন। তার জোড়া-তালি ব্যাখ্যা তিনি নিজে দিয়েছেন। "গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে ভাটা শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোন ভাবের উৎস খুলে যায় নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে—এও ত ভাবের প্রবাহের ভাঁটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাঁটার মুখে নূতন কিছু করতে হলে, কালের স্রোতের উজান বইতে হয়—তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা সনাতন জ্যাঠামি।"—(নানা কথা)। তারিফের যোগ্য, অক্ষমদের এমন পঙ্গু অজুহাত বোধ হয় এই প্রথম শোনা গেল। তাই 'সনাতন জ্যাঠামি'-তে তিনি সারাজীবন অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক, তিনি তো 'সনাতন জ্যাঠামি'র পরিচয় দিলেন না। প্রতিভার শক্তি সর্বগ্রাসী। প্রকৃত অভিজাত বংশে জন্মেও মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যের ভূমি। মহত্তর দৃষ্টি তাঁকে আমন্ত্রণ দিয়েছিল মানুষেরই সমতলে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ তাই কুৎসিতের বিরুদ্ধে। শিবসুন্দরের জয়-মুখর সঙ্গীতে তাঁর জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত রচনা করেছিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁর জন্মদিনের কবিতাগুলি কতো না

দুঃসহ অন্তর্বেদনার প্রস্রবণ। প্রমথ চৌধুরীর এই শিল্পীজনোচিত সহানুভূতি ও চরাচর-ব্যাপ্ত অখণ্ড দৃষ্টি ছিল না। কবিওয়ালাদের শ্মশানে তাঁর জন্ম। সে-ঐতিহ্যের আতস-বাজি তাঁকে ধাঁধিয়ে রাখল। এই জন্য প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে, তিনি ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর। 'রায়তের কথা' লিখলেন প্রমথ চৌধুরী কিন্তু তার সহানুভূতি কোন কর্মসংগ্রামে প্রকাশিত হয় নি। তার নিজেরই স্বীকারোক্তি, "জমিদারী সেরেস্তায় আমি আমলাগিরি করেছি" (রায়তের কথা)। রবীন্দ্রনাথ এই আমলাদের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'রায়তের কথা'র ভূমিকায়। "প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়।' বীরবল মরীচিকায় শান্তি খুঁজেছিলেন। তাই তাঁর গদ্যের পটভূমি সামন্ত-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পীঠ অথবা ইঙ্গবঙ্গ সমাজ। সমবেদনা ও কার্য্যক্ষেত্রে তার বিকাশ—এই সমন্বয়ের বিমুখিতাই প্রমথ চৌধুরীর সিনিসিজম্ (cynicism)-এর জনক। আজ কংগ্রেসের আশু মৃত্যুই শুভ। ঐতিহাসিক কর্তব্য-লীলা তার সমাপ্ত। কুড়ি বছর আগে একমাত্র ভাল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আমাদের জাতীয়তা বীজের বিকাশ-ভূমি কংগ্রেস-কে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন যাত্রার দল। The world looks yellow to the jaundiced eye। আসলে তিনি নিজেই যাত্রার দলের অধিকারী। আখড়াই-হাফ-আখড়াই ঐতিহ্যের মালিকানা-ভোগী। এই জন্য শিল্পীর আসন তাঁর ভাগ্যে জুটল না। চূণ, কালি, ভাঁড়ের আদখেলার চাকচিক্যে বাববলী আকর্ষণ বেশী। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানে নিহিত।

সুধীরকুমার চৌধুরী

অসি

আজি ভয়-বিহ্বল রাতে
একখানি অসি দাও, হাতে ওর অসি দাও,
একখানি অসি দাও হাতে।
হতবল পেশী তার জানি,
তবু দাও অসি একখানি।
নিবিড় তিমিরে হায়, আঁখিতারা ডুবে যায়,
আলো মরে' যায় অপঘাতে,
বনপথে কোথা দিশা, দুর্য্যোগ-ঘন নিশা,
একখানি অসি দাও হাতে।
জীর্ণ আগল তার দ্বারে,
হিংসা ফুঁসিছে চারিধারে,
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা
মুখ গুঁজে আছে বিছানাতে,
বাহুতে যেটুকু বল তাই তার সম্বল
আজি ভয়-বিহ্বল রাতে,
একখানি অসি দাও, হাতে ওর অসি দাও,
একখানি অসি দাও হাতে।

গেছে যুগ-যুগান্ত কেটে
জমি চষি', বুনি' তাঁত, করে দিন অতিপাত
নীরবে দিবসরাত খেটে।
শুধাতে থাকেনি অবসর
কোন্ রাজা এল কার পর,

অসি

খুসি থাকে বারোমাস জুটিলে কৌপীনবাস,
দুমুঠো পড়িলে ভাত পেটে।
তারও পরে যাহা রয় জেনেছে সে তার নয়,
দিয়েছে দরাজ হাতে বেঁটে।
জীর্ণ আগল তার দ্বারে,
দস্যু ফিরিছে চারিধারে,
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
চোখে দেখে, বুক যায় ফেটে,
আঙুলিয়া ক্ষুদকণা দিতে পারে সান্ত্বনা
একখানি অসি পেলে হাতে,
দুর্যোগ গেলে কাটি' আবার চষিবে মাটি,
কৌপীন বুনিবে ফিরে তাঁতে।

তোমরা যে রাজার স্বজাতি,
আজ তোমাদেরও ঘরে কড়কড়ি' বাজ পড়ে,
বারে বারে নিবে যায় বাতি।
আজি ভয়-বিহ্বল রাতে
মিছে হাত রাখো তার হাতে,
ছাড়া পেলে হাতদুটি কেটে করে কুটিকুটি
নিবিড় তিমিরভরা রাতি।
যে আকাশে তুলে চোখ ভোলে ভয়, ভোলে শোক,
সেথা যে মৃত্যুর মাতামাতি।
আকাশে মরণ মেলে ডানা,
দেবতা কোথায় নাহি জানা,
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
একা সে তাদের আজি সাথী,
তারই পানে চোখ তুলে র'বে এরা ভয় ভুলে,
আজি দুর্যোগ-ঘন রাতে,

সুধীরকুমার চৌধুরী

যদি হাতে অসি দাও, হাতে ওর অসি দাও,
একখানি অসি দাও হাতে।

আজি কে মৈত্রীর কথা কহে?
কৌপীন ক্ষুদকণা, তার বেশী চাহে ত না,
যেটুকু নহিলে তার নহে।
বেশী কিছু থাকে যদি তার
সেথায় মৈত্রীর অধিকার।—
সেইখানে যদি থাকো, হাতে তার হাত রাখো,
অসি তার কোষে ঢাকা রহে।
কারও ধনে নাহি সাধ, কারও সাথে নাহি বাদ,
সহে না যা তাও তার সহে।
আজিকে যে মরণের বাণে
নিরীহজনেরে ওরা হানে।
ঘরে জায়া-দুহিতারা ভয়ে সম্বিৎহারা,
কে আজি তাদের ভার বহে?
বিরোধে বিরোধ ডাকে, নির্ব্বিরোধীরে রাখে
কে এই মরণ বরষাতে?
হৃতবল তার পেশী, হয়ত চাহে না বেশী,
মরিতে সে চায় অসি হাতে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

বাংলা সিনেমা

অনেক যন্ত্রশিল্পের মতো 'বাংলা সিনেমাও সমরোত্তর যুগের সন্তান। সে-সমর আরেকটি সমরের জন্মদান করলেও বাংলা সিনেমার নাবালকত্ব এখনো ঘোচেনি। দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অবিশ্যি তা অতিক্রম করেছে, কথাও ফুটেছে মুখে, তবে মগজ ততটা পাকে নি। একটা যন্ত্রশিল্পে বিপ্লব আস্‌তে পঁচিশ বৎসর সময়টা খুব বেশি নয় মানি কিন্তু সে কথা খাটে তেমন যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যাকে তার নিজ সম্ভাবনা একা আবিষ্কার করে চল্‌তে হয়। বিলিতি সিনেমা, যে-রকমই হোক, একটা ক্ষেত্র তৈরী করে' কিছুটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল—সে-ক্ষেত্রে বাংলা সিনেমার যখন আবির্ভাব হল, তখন তা বিলিতি ছবির গোড়ার পদক্ষেপগুলো মস্ক না করে নিলেও পারত। যৌন-আবেদনের মোহ ছেড়ে বিলিতি ছবিগুলো তখন সত্যিকারের নাট্যসাহিত্যকে রূপদান করবার চেষ্টা করছিল—তাদের এই অগ্রগতির খোঁজ রাখবার প্রয়োজন বাংলা সিনেমা অনুভব করে নি—নায়িকার নগ্নমূর্ত্তি বা বিয়ের পিঁড়ি থেকে নায়কের পূর্ব্বতন প্রেমাস্পদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য পরিবেশন করতে পারলেই তখন বাংলা সিনেমা ভেবেছে যে ছবি দেখানোর চরম হয়ে গেল। সাহিত্যকে জীবন্ত করে আনন্দের রসায়ন তৈরী করাই যে সিনেমার আদর্শ, ততদিনে এই সত্যবোধটা বাংলা সিনেমার মনে জন্মালে হয়ত খুব অনুচিত হত না। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সার্থক গল্পউপন্যাসগুলোর জনপ্রিয়তা ছাড়াও তখন বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন সাহিত্যিক আন্দোলন পাঠকদল সঞ্চয় করে নিচ্ছিল কিন্তু বাংলা ছবি যাঁরা প্রথম তৈরী করতে সুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের শরণ নেওয়ার শুভবুদ্ধিও তাঁদের মাথায় আসেনি—কতকগুলো অপদার্থ কাহিনীর অপদার্থতর চিত্ররূপকেই তাঁরা বাংলা ছবি বলে চালাতে লাগলেন। এই সহজাত অভ্যাস বাংলা সিনেমা আজও ত্যাগ করে নি।

'তাজমহল কোম্পানী'কে ধন্যবাদ যে তাঁরাই প্রথম সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সিনেমার যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন—তাঁরা চিত্ররূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত দু'টি গল্পের। 'মানভঞ্জন' আর 'আঁধারে আলো'তেই বাঙালী প্রথম দেখ্‌তে পেল তাদের অতি-পরিচিত জীবনের চলচ্চিত্র। বাংলা সিনেমা-শিল্পের প্রসারের জন্য ম্যাডেন কোম্পানীর অসামান্য চেষ্টা যতই প্রশংসার্হ হোক না কেন—সত্যের খাতিরে একথা আমরা বল্‌তে বাধ্য যে তাঁরাই প্রথম ঘড়ির কাঁটা উল্টো করে ঘুরিয়ে দিলেন। 'মানভঞ্জন' ও 'আঁধারে আলো'র সাফল্যের পর আরো চড়া রঙের গল্প পরিবেশন করে দর্শক বাগাবার চেষ্টা তাঁরা করলেন সত্যি কিন্তু তার দরুণ যেতে হ'ল তাঁদের উনিশ শতকে বঙ্কিমী আমলে। সাহিত্যের গতি যে সময়ে বঙ্কিমী আমল পেছনে ফেলে শরৎচন্দ্রের পাঠক সংগ্রহে ব্যস্ত, ম্যাডেন কোম্পানী তখন দর্শকদের শরৎচন্দ্রের আওতা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আওতায় নিয়ে ফেল্‌লেন। ম্যাডেন কোম্পানীর এ শব-সাধনাও বাংলা সিনেমা ভুল্‌তে পারে নি।

শরৎচন্দ্রের পর বঙ্কিমচন্দ্রের শরণ নেওয়া যে শিল্প-প্রগতির দিক থেকেই শুধু অপরাধ তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে চিত্রনির্ম্মাতারা তাঁদের চিত্র-নির্ম্মাণের অজ্ঞতা ঢাকবার অপরাধও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চিত্রাত্মক, দীর্ঘ, নাটকীয় এবং কাহিনীসমৃদ্ধ। সে-উপন্যাসকে চিত্রোপযোগী করে তুল্‌তে সামান্য পরিশ্রমের প্রয়োজন, অবশ্য সে-পরিশ্রম না কর্‌লেও চিত্রের খুব বেশি হানি হয় না। একটি ছোট গল্পকে দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ একটি ছবির আকার দিতে গেলে, তার উপর নূতন করে চিত্র-নাট্য লেখা দরকার এবং তাতে মৌলিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। এ বিপদে ঝাঁপ দিয়ে কি লাভ যখন হাতের কাছে তৈরী উপন্যাসই পাওয়া যায়।' সে উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠার বর্ণনা-মাফিক ছবি পরপর তুলে গেলেই যখন নির্ব্বিবাদে একটা বাংলা ছবি দাঁড়িয়ে যায় এবং সে কাজ যখন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকজন লোক দিয়েও অনায়াসে সম্পন্ন হ'তে পারে তখন আর গুণীজ্ঞানীদের পেছনে অর্থের অপচয় করে লাভ কি। মোটের উপর ভারতীয় বাণিজ্য-শিল্পমাত্রই যে কুৎসিত ভিত্তির উপর গড়ে উঠছে

বাংলা সিনেমাও তা থেকে বাদ পড়েনি—শিল্পের জন্যই শিল্প গড়ে উঠুক, শিল্পের উন্নতি হোক, এই শুভ আদর্শ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নেই—কি করে সামান্য খরচে ফাঁকি দিয়ে অসামান্য লাভ করা যায় আমাদের প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই থাকে তা-ই। ফাঁকি ধরা না পড়া পর্যন্ত লাভের লোভ কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যায় না। বাংলা সিনেমা-শিল্প যে বালখিল্যের আকার ধরে আছে, আশানুরূপ উন্নতি বা সাফল্য যে তার এখনো হচ্ছে না, নূতন ভাবধারা পরিবেশন করতে এখনো যে তা নিতান্তই অক্ষম, তার মূলে আছে প্রযোজকদের এই ফাঁকি দেবার ইচ্ছা—খরচের দিকে তাঁরা অস্বাভাবিক রকম সাবধানী বলে অকৃতীলোক দিয়ে ছবির কারখানায় ভীড় জমিয়ে তুলছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গভীর বর্ণ অকৃতীলোকের মারফৎ পর্দার গায়ে প্রতিফলিত হলেও কাহিনীর দিকটাকে বিশেষ দুর্ব্বল করতে পারে নি। কিন্তু দৃশ্যসংস্থান, চিত্রগ্রহণ, আলোক সম্পাতের যে দুর্দ্দশা সেদিনে বাংলা ছবির হয়েছে তা অবর্ণনীয়—ছবি তৈরীর ভার যাদের হাতে ন্যস্ত ছিল তারা তাদের এদিককার ত্রুটীগুলোকে কিছুতেই আর ঢাকতে পারে নি। ছবি তৈরী হত নিতান্ত হেলাফেলায়, অতি সাধারণ একটু মনোযোগও তাতে দেওয়া হত না। বাঙালী দর্শকদের স্বাজাত্যপ্রীতির এই বোধ হয় সব চেয়ে বড় নিদর্শন যে সে-সব ছবি দেখতেও তারা অজস্র অর্থব্যয় করেছে। এই নবজাত শিল্পটির সম্ভাবনা যে কত দূর এ থেকেই যে-কোনো দূরদর্শী ব্যবসায়ী বুঝে নিতে পারত—আর চেষ্টা করত যাতে তা স্বাভাবিক উন্নতির দিকে গড়ে ওঠে। কিন্তু তেমন লোক বাংলা দেশে তখন কেউ ছিল না—এখনো আছে কিনা প্রশ্ন-সাপেক্ষ।

কালক্রমে ম্যাডেন কোম্পানীর ফসল তোলবার দিন অতীত হ'ল—এ সময়ে দেখা যায় বাঙালী পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে' কয়েকটি আধুনিক উপন্যাসে হাত দিয়েছে। 'চোরকাঁটা' বা 'চাষার মেয়ে' সময়ের হিসেবে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' থেকে আধুনিক হ'তে পারে কিন্তু বিষয়বস্তুতে তারা কতোটা আধুনিক তা আমরা জানিনে। অন্তত এটুকু বলা যায়, অন্যায় অবিচারে কলঙ্কিত সমাজকে শরৎচন্দ্রের পর যাঁরা

সামান্য আঘাত দিতে পেরেছিলেন তাঁদের কেউ 'চোরকাঁটা' বা 'চাষার মেয়ে'র গ্রন্থকার নন। কাজেই সমাজের যখন সাহিত্যের উপর দাবী ষোল আনা, আর মতবাদ বা মনোভাব প্রচারের বাহন হিসেবে সিনেমা যখন সাহিত্যের স্থান দখল করে নিচ্ছিল—বলা বাহুল্য তখন বাংলা সিনেমা যথাকর্ত্তব্য পালন করতে পরাঙ্মুখ হয়েছে। সিনেমা আনন্দের উপকরণ সত্যি, যেমন সাহিত্যও, কিন্তু রেস খেলার মতো সমাজের কোনো উপকারেই তা আসবে না এমন নয়। অত্যন্ত দূষিত ভাবে পরিচালিত হয়েও বাংলার সিনেমা-শিল্প ভেঙে পড়েনি কেননা এর প্রতি সমাজের প্রগাঢ় আকর্ষণ—এই আকর্ষণের সুযোগে সিনেমাকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে তার বেঁচে থাকবার কি সার্থকতা আছে।

হতে পারে যে আফিং ধরানোর মতো সিনেমার নেশা ধরানো ব্যবসায়ের দিক থেকে খুব একটা বড় সাফল্য সূচনা করে। নেশাটা দর্শকদের একবার ধরিয়ে দিতে পারলে, দর্শকরা নেশা করতেই চায়। যন্ত্রোৎপাদিত বিলাস-সামগ্রী মাত্রকেই বাজারে ধরাতে হলে নেশার সামিল করে তুলতে হয়। কিন্তু তার জন্যই ব্যবসায়ীর দায়িত্ব অনেকখানি ক্রেতার যখন এমন অবস্থা যে তার স্নো না মাখলে চলে না তখন স্নো-প্রস্তুতকারক স্নোতে এমন কিছু মেশাতে পারেন না যা ত্বকের পক্ষে অপকারী। ছবি দেখা যখন দর্শকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তখন ছবি যারা তৈরী করেন তাঁদের সাবধানী হতে হবে যাতে মন অসুস্থ হয়ে ওঠে তেমন কিছু ছবিতে না থাকে। এককালে চিত্র, সঙ্গীত এবং সাহিত্য যেমন সমাজের মনকে চালিত করেছে আজ তাদের আসন নিয়েছে একা সিনেমা। চিত্র-নির্ম্মাতাদের উপর যে এতো বড় দায়িত্ব ন্যস্ত, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে তা উপলব্ধি করবার লোক প্রযোজক বা পরিচালকদের মধ্যে কেউ নেই। চিত্র, সঙ্গীত বা সাহিত্যের মতো সিনেমাও যে ক্রমেই বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এগিয়ে সামাজিক মনকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারে এমন ধারণা বাঙালী কোনো চিত্র-নির্ম্মাতা মনে পোষণ করেন কি না সন্দেহ।

সবাক ছবির যুগে শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটার্স'কে দেখি 'চিরকুমার সভা'র রূপ দিতে। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো শুনতে

ভালো বলেই যে 'চিরকুমার সভা' নিউ থিয়েটার্সের প্রথম বাংলা ছবি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল তা নয়, রঙ্গমঞ্চে 'চিরকুমার সভা'র সাফল্যের উজ্জ্বল চেহারাটা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভুলতে পারেন নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ যদি নিউ থিয়েটার্সের থাকৃত তাহলে গোটা বাংলা-সাহিত্যের প্রতিই তাঁদের কৌতূহলের নিদর্শন আমরা দেখতে পেতাম এবং এতদিনে ক্ষমতাবান সাহিত্যিকদের সহায়তায় তাঁরা সিনেমার জন্য একটা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করে নিতেন। উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীর একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান চক্ষুলজ্জার দরুণই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে কাহিনীকার হিসেবে বাদ দিতে পারেন না, সম্ভবত তার জন্যই এঁরা দুজন নিউ থিয়েটার্সে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন এবং অর্থোপার্জ্জনে 'চিরকুমার সভা'র চেয়ে 'দেবদাস' ঢের বেশি কার্য্যকরী হওয়াতেই শরৎচন্দ্রের নামটা সেখান থেকে কেটে দেওয়া হয় নি। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' কোনো রকম সুস্থ জীবনের আদর্শই বহন করে না, আত্ম-বিনাশের একটা নিউ-রোটিক মনোভাবকে ছবিতে বিস্ফারিত করে দেখাবার তাগিদ যে শিক্ষিত মনে কোত্থেকে আসে আমরা জানিনে। হয়ত তার উৎস সেখানেই যেখান থেকে চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রীতি ফলাও করে পরিবেশন করবার প্রেরণা জাগে।

সিনেমার যতদিন আপন শক্তিতে দাঁড়াবার উপায় না থাকে ততদিনই তা সমসাময়িক জনপ্রিয় নাটক বা উপন্যাসের আশ্রয় নিতে পারে। নাটক বা উপন্যাস সিনেমার জন্য লেখা হয় না—কাজেই তাদের আশ্রয়ে সিনেমা গড়ে উঠলে তার নিজস্ব গতি এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়ে পড়ে। সিনেমার উপযোগী করে যে গল্প লেখা হবে তার আঙ্গিকের সঙ্গে উপন্যাসের বা নাটকের আঙ্গিক কোথাও মিলতে পারে না। একটা উপন্যাস বা নাটক সিনেমার জন্য পুনর্লিখিত হলেও হাঁসের দলে বকের ভাবটা এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর। সিনেমার জন্য গল্প সিনেমার ধরণে ভেবে তৈরী করা দরকার। সাহিত্যের যে কোনো শক্তিশালী লেখকই এ কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে দিতে পারেন না। সিনেমার আঙ্গিকের সঙ্গে যদি কোনো সুসাহিত্যিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পান, তবেই তাঁকে দিয়ে সত্যিকারের ভালো সিনেমার গল্প তৈরী হতে পারে। এই

সহজ সরল কথাটা তিন বছর আগেও বাংলা সিনেমা বুঝতে চেষ্টা করে নি। আলোকচিত্রে না শব্দ-নিয়ন্ত্রণে নিউ থিয়েটার্স অসামান্য কৃতিত্ব দেখাতে থাক্‌লেও ছবির কাহিনীর দিকটা তার বরাবরই দূষিত থেকে গেছে। বাংলা ছবির অপর কারখানাগুলোর কথা অবশ্য না বলাই ভালো, কেননা তাদের তৈরী ছবিতে কাহিনী-গৌরব ত দূরের কথা, আলোকচিত্রের, শব্দ-নিয়ন্ত্রণের, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতিরই আমূল সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। একরেখে না করে ছবিতে গল্প পরিবেশনের কৌশল নিউ থিয়েটার্সেই আমরা প্রথম দেখেছি। বহুকাল পর্য্যন্ত নিউ থিয়েটার্সের ছবি দিয়েই বাংলা ছবির মর্য্যাদা বুঝতে হয়েছে। কাজেই বাংলা ছবির ভালোর দিকটার জন্য যেমন নিউ থিয়েটার্সেরই প্রশংসা প্রাপ্য, তার ক্রটীর জন্য যা কিছু অপ্রশংসাও নিউ থিয়েটার্সের উপরই প্রযোজ্য। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে নিউ থিয়েটার্স যে দায়িত্ব অর্জ্জন করেছিল তার প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা তার ছিল না। ভালো শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকদের শরণ নিতে নিউ থিয়েটার্স ইতস্তত করে নি সত্যি কিন্তু ভালো সাহিত্যিকের সহযোগিতা যাচ্ঞা করতে তার রসবোধের আভিজাত্যে বেধেছে। বাঙালীমাত্রেরই এই একটা অভিমান আছে যে সাহিত্য-বোধটা তার সহজাত এবং প্রায় হস্তামলকবৎ। সাহিত্য সম্পর্কে চরম মতামত দেওয়া ছাড়াও যে কোনো বাঙালী যে কোনো সুযোগে সাহিত্য-সৃষ্টির স্পর্দ্ধা রাখে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মীরাও এই অভিমান হতে মুক্ত ছিলেন না। চিত্রার্পিত করবার মতো উপন্যাস বা নাটকের যখন অভাব ঘটল তখন তাঁরা নিজেরাই সিনেমার জন্য গল্প তৈরী করতে সুরু করে দিলেন। যেন খুসী-মাফিক কতকগুলো চরিত্রের মারফৎ কতকগুলো ঘটনা জড় করে চরিত্র-গুলোর মুখে কতকগুলো ন্যাকামীপূর্ণ কথাবার্ত্তা ঠেসে দিলেই গল্প হয়ে গেল —এই ছিল হয়ত তাদের ধারণা। চরিত্র স্ফুরণ, ঘটনার যুক্তিপূর্ণ পরিণতি, সংলাপের স্বাভাবিক মনোজ্ঞতা যে গল্পের প্রাণবস্তু এবং তার সুচারু ব্যঞ্জনা যে সাহিত্যিকের হাতের অপেক্ষা রাখে এই সাধারণ সত্যের প্রতি মনোযোগী হতে নিউ থিয়েটার্সকে বড় একটা দেখা যায়নি। বাংলা গল্পলেখকদের পরামর্শ নিতে কর্ত্তৃপক্ষের অভিমান আহত হয়েছে অথচ কোনো ইংরেজী

গল্পকে অনায়াসে আত্মসাৎ করতে এতটুকু লজ্জায় বাধেনি। 'দিদি', 'মুক্তি', 'রজতজয়ন্তী' তার সাক্ষী দেবে।

কেবলমাত্র আঙ্গিকের সাফল্য দিয়ে কোনো চিত্র-প্রতিষ্ঠান চিরদিন একক প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকতে পারে না। ভারতলক্ষ্মীর 'পরশমণি', 'অভিনয়' এবং ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রিক্তা'র পর আলোকচিত্রে, শব্দনিয়ন্ত্রণে এবং দৃশ্যসজ্জায় নিউ থিয়েটার্সের একক প্রভুত্ব ম্লান হয়ে এসেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে ছবির উৎকর্ষ বিধান করা যে খুব আয়াসসাধ্য নয় এবং চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিদায়ক ছবি তৈরী করতে পেরে নিউ থিয়েটার্স যে চিরকাল বাহবা পাবার মতো একটা কাজ করে বসেনি 'পরশমণি' ও 'রিক্তা'র আবির্ভাবের পর দর্শকরা তা বুঝতে পারল। অবশ্য নিউ থিয়েটার্সের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল তার গুণপনাই অনুকরণ করেনি, তার দোষগুলোও আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। বিলিতি গল্পকে বাংলা ছবিতে রূপান্তরিত করে, তারা হয়ত ভেবেছিল, এ কাজে যদি নিউ থিয়েটার্স নিজেকে অপরাধী মনে না করে তবে আর তাদেরও তাতে এমন কী অপরাধ হবে?

সত্যি কথা, বাংলা ছবিকে উন্নতির দিকে চালিয়ে নেবার একমাত্র সুযোগ একসময় নিউথিয়েটার্সেরই ছিল, তার আদর্শে অন্যান্য ছবির কারখানাগুলোও অনায়াসে সুস্থ ভাবে গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু খানিকদূর এসে নিউ থিয়েটার্স এমনি থেমে গেছে যে সেখান থেকে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত তার হ'লনা। ছবির যেন একটা ছাঁচ সেখানে তৈরী হয়ে গেছে—নির্ভুল-ভাবে সেই ছাঁচ-মাফিক ছবিই সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। সেখানে গল্প তৈরী হয় শরৎবাবুর কাঁচা ভাবাবেগের ছোপ নিয়ে, ক্যামেরা চলে একই ভঙ্গীতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরোনো মুখে পুরোনো ঢং-এর কথাবার্ত্তা, গানের সেই ঝিমিয়ে পড়া একঘেয়ে সুর। এই গণ্ডীবদ্ধতা অসহ্য বিরক্তিতে ইদানীং দর্শকদের অস্থির করে তুলেছে। স্থিতিশীলতা আর্টের পক্ষে মারাত্মক অস্ত্র, আর্ট মানুষকে আনন্দ দেয় এবং নিজে বেঁচে থাকে শুধু তার গতিশীলতার দরুণ, নিউ থিয়েটার্স তাকে রেফ্রিজিরেটারে সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করছে। আর বাংলা দেশেরও দুর্ভাগ্য যে আজ পর্য্যন্ত এমন একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলনা, যা প্রগতিশীলতায় নিউ থিয়েটার্সকে ডিঙিয়ে যেতে পারে।

বাংলা ছবির এই শিথিল, পঙ্গু অবস্থাকে সক্রিয়ভাবে আক্রমণ করেছে হিন্দি ছবি, বিশেষ করে বম্বে টকিজের ছবিগুলো। হিন্দি ছবির সাফল্যের একমাত্র কারণ, চুলচেরা ব্যবসায়িক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে ছবিগুলো তৈরী হয়, শিল্পজ্ঞানের অসার দম্ভ নিয়ে ছবির কারখানাকে কেউ সেখানে ফুর্ত্তির কারখানা করে গড়ে তোলেনি। ব্যবসায়িক বুদ্ধি আছে বলেই হিন্দি ছবিওয়ালারা সমাজ-মনের তোয়াক্কা রাখে, আর তাই 'অচ্ছুতকন্যা', 'ওমেন', 'পড়শী', 'নয়া সংসারের' মতো ছবি তৈরী করবার প্রয়োজন অনুভব করে, সংগঠনশিল্পীরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে বলেই 'আদমী' বা 'সিকান্দরে'র মতো ছবি সেখানে তৈরী হয়। সিনেমাকে খাঁটি বাণিজ্যশিল্পের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছে বলেই বম্বের ছবিতে বহু শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে অভিনেত্রী হিসেবে অসঙ্কোচে এসে যোগদান করছে এবং তার ফলে প্রত্যেক ছবির মেয়ে-ভূমিকাগুলো হয়ে উঠছে অনবদ্য। বাংলা ছবিতে মেয়েদের কালো দাঁতের উপদ্রব কমেছে সত্যি কিন্তু অসঙ্কোচে শিক্ষিত ভদ্র মেয়েরা এখনো সিনেমা-অভিনেত্রী হতে চায় না—সে ত্রুটির জন্য, বলা বাহুল্য, ভদ্র-মেয়েদের দোষ দেওয়া চলেনা। হিন্দি ছবিতে গান যতটা সু-গীত হয় বাংলা ছবিতে ততটা তা হয় না। কাজেই বাংলা দেশে যদি আজ হিন্দি ছবির চাহিদা বেড়ে গিয়ে থাকে তাতে বাংলা ছবিওয়ালাদের বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হবার কারণ নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে উত্তমের কাছে অধমের পরাজয় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বাংলা ছবির সঙ্কটকাল এসে গেছে, একথা চিত্রনির্ম্মাতারা বুদ্ধির দোষে বুঝতে না পারলেও দর্শকরা তা খুবই বুঝে নিয়েছে। চিত্রনির্ম্মাণের আমূল সংস্কার না করলে একদিন হয়ত দেখা যাবে যে বাংলা দেশে আর বাংলা ছবি দেখানো হচ্ছে না—বাংলা দেশ হিন্দি ছবিরই বাজার। ভাবতে অবাক লাগে, আজ পর্য্যন্ত বাংলা ছবির ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্যকে ছেঁটে ফেলতে কেউ উদ্যোগী হলনা। কতকগুলো ফালতু ইয়ার্কি ঢুকিয়ে ছবিকে টেনে অনাবশ্যক রকম বড় করে কাহিনীর তীক্ষ্নতাকে নষ্ট করবার কুপ্রথা উচ্ছেদ করবার দিন কি এখনো আসে নি? ৮০০০ হাজার ফিট যদি বিদেশী ছবি 'হিট্ পিক্‌চার' হতে পারে, দর্শককে আকর্ষণ করতে বাংলা ছবির কেন ১৫০০০ হাজার ফিট লাগবে? ইঙ্গিতমূলক কৌশল অবলম্বন করাই সিনেমার ধর্ম্ম;

ইঙ্গিতধর্ম্মী সিনেমার গল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অজগর তৈরী করার মধ্যে মোটা বুদ্ধির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই মেলেনা। সত্যি কথা যে দর্শকরা আজ ১৫০০০ হাজার ফিট ছবিতেই অভ্যস্ত কিন্তু তাদের সে-অভ্যাস ৮০০০ হাজার ফিটে ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই নির্ভর করে। সমস্ত রাত্রিব্যাপী আনন্দ করবার অবসর আমাদের জীবনে নেই, অতীত দিনের সে-অভ্যাসকে বাঁচিয়ে রাখবার তবে কি মানে থাকতে পারে? অবশ্য আমাদের মানসিক জড়তাই এমনি যে নূতন আলোতে কিছু দেখবার চেষ্টা কোনো সময়ই হয়ে ওঠেনা কিন্তু তাই বলে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দান করবার ভার যাদের উপর ন্যস্ত, তারাও যদি সাধারণের মত জড়তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তবে আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রা কোন কালেই সম্ভব হতে পারে না।

সিনেমা যে কেবল আনন্দেরই উপকরণ নয়, সাহিত্যের মতই আদর্শ বিস্তারের বাহন—এ কথা বাংলা সিনেমা যতদিন বুঝতে না পারবে ততদিন পর্য্যন্ত তার গতি অধোগামী না হয়ে থাকতে পারেনা। অসুস্থ পঙ্গু সমাজকে আঘাত করা, সামাজিক কল্যাণের ইঙ্গিত দেওয়া, মানুষের শুভ ভবিষ্যৎ রচনা করা যদি সিনেমার গল্পগুলোর উপজীব্য হয়ে ওঠে, তাহলেই সমাজ-দেহে তার বেঁচে থাকা সার্থক, তাহলেই সমাজ তাকে অপরিহার্য্য বলে গ্রহণ করবে। নাচ-গান-সাজসজ্জার মোহ মদের মত সাময়িক উত্তেজনা দিতে পারে কিন্তু তার প্রতি অরুচি দেহ আপনা থেকেই জাগিয়ে তোলে—দেহকে বাঁচতে হলে চাই পুষ্টিকর আহার, রোকনা তা তীব্র ঝাঁঝাল—তীব্র প্রয়োজনের জন্যই তা ভালো। বাংলা সিনেমা এদিকে যে অকিঞ্চিৎকর ঝোঁক দেখিয়েছে মনে হয় তা যেন নেহাৎ দায়ে পড়ে—নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে আদর্শের প্রেরণায় এ পথ অবলম্বন করেনি। 'ডাক্তার' বা 'আহুতি'র গল্প বাংলা সিনেমাকে যে সমাজ-বোধের মন্ত্র দিতে চেয়েছে, তাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করবার মতো সুস্থ সবল দৃষ্টিভঙ্গী সিনেমার কর্তৃপক্ষদের হয়ত নেই, তা যদি থাকত তবে ১৯৪২ সনের আবহাওয়ায়ও 'কর্ণার্জ্জুনে'র মত গল্পের পেছনে অজস্র টাকা অপব্যয় হতনা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ঝাঁপ

১

না, না, আপনাদের ও ধারণা ভুল। তারাপদ চোর নয়, জোচ্চোর নয়, ধড়িবাজ নয়। তারাপদ হচ্ছে গভীর জলের মাছ। সেই যে তিনটি মাছের গল্প আছে তাদের মধ্যে যেটির নাম অনাগত বিধাতা সেটির নাম তারাপদ কুণ্ডু।

ভারতবর্ষে যেদিন স্প্র্যাট ও ব্র্যাড্‌লী গ্রেপ্তার হন, ইংলণ্ডে সেদিন তারাপদর চোখে সর্ষে ফুল। তারপর যেদিন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হল সেদিন তারাপদর মনে জুজুর ভয়।

"কমরেড কুণ্ডু, এ কী খবর?" তাঁকে ঘেরাও করে তার সাগরেদরা।

"কেন, কি হয়েছে?" তারাপদ ঠাণ্ডা মেজাজে পাইপ ধরায়। "কে না জানত যে এমন হবে? আমি ত সেই কবে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট একদিন জাল গুটিয়ে আনবে, তখন ধরা পড়বে সেই সব মাছ যারা ডুব দিতে না শিখে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কেমন ফলল কি না আমার কথা?"

কোন্ দিন যে তারাপদ অমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অবশ্য কারো স্মরণ ছিল না। স্বয়ং তারাপদ কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠতে পারে।

'যাক, এ নিয়ে তোমরা উদ্বেগ বোধ কোরো না।" তারাপদ অভয় দেয়। "মামলা ত? আর ত কিছু নয়? সাজা হলে তার উপর আপীল আছে। আপীল হারলে বড় জোর জেল বা দ্বীপান্তর।"

"সাকো আর ভানজেটির যে প্রাণদণ্ড—" বলে উঠল এক বেরসিক।

"হুঁ। প্রাণদণ্ড অত সোজা নয় ভাবতে।" তারাপদ বলতে বলতে তলে তলে শিউরে ওঠে। কে জানে, যদি প্রাণদণ্ডই হয়। "হলেই বা।

আমার মনে হয় আমাদের প্রাণ এতটা মূল্যবান নয় যে আমরা ইতস্ততঃ করব। করবে তোমরা কেউ ?"

আত্মাপ্রসাদের আত্মারাম জানেন প্রাণ দিতে ইতস্ততঃ করবেন কি না। বললেন, "যে কোনো নির্যাতনের জন্যে আমরা প্রস্তুত।"

"মৃত্যুর সঙ্গে," হাইদারী বললেন, "আমার বিয়ের কথা আছে।"

তারাপদ তার অমাত্যদের অসম সাহস দর্শন করে হৃষ্ট হল, কিন্তু সেই মুহূর্তে স্থির করে নিল ইংলণ্ডে আর বেশী দিন নয়, কী জানি কোন্ দিন না রুজু হয় ফিনস্‌বেরী কন্‌স্পিরেসী কেস।

নির্ব্বাচনকার্য্যে তারাপদর উৎসাহ একটুকুও কমল না, অপরের বিমনা ভাব তার তামাসার খোরাক হল। "পুলিশের স্বপ্নে বিভোর থেকো না হে। পুলিশ একদিন শুভাগমন করবেই।......ধন্য তোমার প্রাণ, যার জন্যে তুমি এত চিন্তিত। আমাদেরও ত প্রাণ আছে। কই, প্রাণের চিন্তা ত নেই।"

তারাপদ সকলের পিঠ চাপড়ে দেয়, বগলে হাত গুঁজে দিয়ে জড়িয়ে ধরে। "সাবাস, কমরেড। খুব খাটছ তুমি। এই ত চাই। কমিউনিজম প্রত্যাশা করে, প্রত্যেক কমরেড তার কর্ত্তব্য করবে।"

বাদলের সঙ্গে তারাপদর ক্বচিৎ দেখা হয়। এক বাড়ীতেই থাকলে কী হবে, নির্ব্বাচনের গোলমালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার ঠিক থাকে না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তারাপদ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "খুব নাম কিনলে। কই, কাউকে ত দেখলুম না তোমার মত রক্ত জল করে দিনরাত খাটতে। সাকলাতওয়ালা জিতবেনই, এবং একমাত্র তোমার জন্যে।"

বাদল অপ্রস্তুত বোধ করে। বাস্তবিক সে এতটা প্রশংসার যোগ্য নয়। তার অনেকটা সময় যায় ব্রনস্কির ফ্ল্যাটে। সেখানে মাদাম ব্রনস্কি তার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন আর ব্রনস্কি করেন তার সঙ্গে তর্ক। মূর্ত্তিটা কিছুতেই তার পছন্দ হচ্ছে না। গাল দুটো চোপ্‌সা, মাথার চুল স্বল্প। বেশ, তা না হয় বাস্তবতার খাতিরে সহ্য হয়। কিন্তু বাদলের পরম সম্পদ তার চোখ দু'টি। গোয়েন বলতেন, "বাদল, তোমার চোখে চোখ রেখে আমি

কাকে দেখতে পাই, জান? যীশুকে।" তার সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ মাদাম ব্রনস্কির কল্যাণে না থাকার সামিল। বাদল তাই রোজ একবার গিয়ে চোখের সঙ্গে চোখাচোখি করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানায়, "হল না।" মাদামের অসীম ধৈর্য্য। একটি মূর্তি ভালো হলে দশটির অর্ডার আশা করেন, ভারতীয় ছাত্রেরা নিশ্চয় সকলেই রাজপুত্র।

"আমি," বাদল সসঙ্কোচে বলে, "কী-ই বা করেছি। তোমার তুলনায় আমার—"

"থাক্, থাক্, বলতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার সেই প্যাক্ট্ মনে আছে ত? এবার সাকলাতওয়ালা, এর পরের বার বাদল সেন, তার পরের বার তারাপদ কুণ্ডু। অবশ্য ততদিনে হয়ত পার্লামেণ্ট উঠে যাবে, সোভিয়েট গজাবে। কিন্তু মনে রেখো কমরেড। Gentleman's agreement."

এমনি করে সবাইকে তারাপদ হাতে রাখে। যদি বা আগে কখনো কখনো মেজাজ গরম করেছে, মীরাট মামলার পর থেকে তার মেজাজটি একেবারে বরফ। ডিক্টেটারগিরি ফলাতে আর যার প্রবৃত্তি হোক, তারাপদর প্রবৃত্তি নির্বাচনের ফলাপেক্ষী। সাকলাতওয়ালার জয় হলে তার ভর কিছু কমবে, অন্তত কমিউনিষ্টদের পক্ষ নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করবার কেউ থাকবে। সাকলাতওয়ালা যদি হারেন তবে তারাপদর ইংলণ্ডে বাস করা নিরাপদ হবে না। ভারতে ফেরা ত প্রশ্নের অতীত।

তারাপদর মস্ত একটা গুণ, মনের কথা মনে মনে রাখে, কাউকেই জানতে দেয় না। তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু কমসে কম আট জন কি দশ জন। সেই সব অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তার কত রঙ্গই হয়, নাইট ক্লাব ত তারাপদ এখনো ছাড়েনি। কিন্তু যা গোপনীয় তা এক জানে তারাপদ, আর জানেন বিধাতা (যদি থাকেন)। মীরাট মামলার খবর পেয়ে তারাপদ যে প্যারিসের দিকে পা বাড়াবার চেষ্টায় আছে তা সকলের অগোচর।

ফ্রান্সে গিয়ে পসার জমানোর জন্যে মূলধন দরকার। শুধু হাতে সে দেশে গিয়ে করবে কী? তা হলে জোগাড় করতে হয় টাকার। টাকা যা ছিল তার সবটা খাটছে কারবারে। কারবার গুটিয়ে নেবার উপায় নেই।

কারবার থেকে কিছু কিছু তুলে নেওয়া চলতে পারে। তারাপদ প্রথমে সেই ফন্দী আঁটল। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হল না। কাজেই ঠকাতে বাধ্য হয়—চুরি করতেও। যারা রাজনৈতিক কর্ম্মী তাদের এসব নৈতিক শুচিবাই থাকা সঙ্গত নয়, থাকলে কাজ মাটি হয়। দেশের জন্যে ডাকাতী করে তারাপদর পিসেমশাই জেলে গেছলেন, ডাকাতীর মাল কুণ্ডু পরিবারের তেজারতীর মূলধন হ'য়েছিল। এও কমিউনিজমের জন্যে।

"আমার কী।" তারাপদ মনকে বোঝায়। "আমি কি টাকা নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছি? যাচ্ছি ত মৃৎ-স্বর্গের সন্ধানে। একদা যদি শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা আমারই মত নিষ্কাম কর্ম্মীর নিরবচ্ছিন্ন এক্স্‌-পেরিমেণ্টের ফল। ইংলণ্ডে না হয় ত ফ্রান্স হবে। সেখানে না হয়, জার্মানীতে। রাশিয়া ত হাতের পাঁচ।

এ বাসার নিয়ম এই যে ছোট ছোট স্যুটকেস যার যার শোবার ঘরে থাকে, বড় বড় স্যুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সার্ব্বজনীন গুদাম ঘরে—যেমন জাহাজের নিয়ম। চাবীটি তারাপদর পরেটে। সেটি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেলে তুমি আমি নাচার। তাই তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নোটিস দিয়ে রাখতে হয়, যদি গুদামে ঢুকে বাক্স খুলতে ইচ্ছা যায়।

নির্ব্বাচনের কিছু দিন আগে তারাপদ আবিষ্কার করল যে বেসমেণ্টের গুদাম ঘরে মেরামতের অবকাশ আছে, মেরামত করলে ওর পরিসর বাড়বে। অমনি হুকুম দিল মালগুলো ওখান থেকে সরিয়ে তার আফিসে পাঠাতে। সকলেই নির্ব্বাচন উপলক্ষে ব্যস্ত; বেশীর ভাগ বাইরে ঘুরছে। তারাপদর হুকুমনামা যদিও সকলের ঘরে পৌঁছাল তবু চোখে পড়ল মাত্র দু' একজনের। তাঁরা আপত্তি জানালেন না। সুতরাং মাল চালান হল ইণ্টারন্যাশানাল ফিল্ম এক্সচেঞ্জের আপিসে। সেখানে হাজির হবার দিন দুই পরে সাকলাতওয়ালার পরাজয়। তা শুনে তারাপদই সর্ব্বপ্রথম তার কাছে ব্যথা নিবেদন করল। আর সেই দিনই মালগুলি প্রেরণ করল বিভিন্ন pawn shop-এ।

কেবল স্যুটকেস্ ও ট্রাঙ্ক নয়। কতজনের কতরকম সখের জিনিষ ছিল। বাদলের বই, ব্রাকনারের chewing gum, বরসনের ski খেলার

"নিন না, সার, আমার এই চেক্‌খানা।" এ নিয়ে একটা পাউণ্ড দিন, দয়া করে। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের চেক্ বিশ্বাস করতে পারেন।"

যুবকটি তা দেখে বোকা বনল। "থাক আপনার চেক্-নিয়ে আমার কাজ নেই। আপনি এক পাউণ্ড চান, আমি আপনাকে পাঁচ শিলিং দিতে পারি। ওতে আপনার পেট্রল কেনা হবে।"

তাই নিল তারাপদ। "থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ রায়।"

মিঃ রায় পরে আপশোষ করেছিলেন কেন তারাপদর চেক্ নেননি। নেননি রক্ষা। তারাপদর চেক্ যারা যারা নিয়েছিল তাদের অনেকের কাছে পুলিশ গেছল তার ঠিকানার তল্লাসে।

তারাপদর শেষটা এমন হয়েছিল যে সে বন্ধুবান্ধবের ওভার কোট পর্য্যন্ত ধার করত—ওভার কোট বা রেণ কোট। বলা বাহুল্য সেগুলি সেকণ্ডহ্যাণ্ড পোষাকের দোকানে বিক্রী করত। যথালাভ।

একদিন স্নেহময়ের ওখানে উপস্থিত হয়ে তারাপদ বলল, "বড় বিপদে পড়ে তোমার দ্বারস্থ হলুম, স্নেহময়। নইলে তোমার সেই punch আমি জীবনে ভুলব না। যাকে বলে ওস্তাদের মার। বাব্‌বা, আমার ঘাড়ের উপর যে মুণ্ডটা আছে সে কেবল আমি তারাপদ কুণ্ডু বলেই। আর কখনো কাউকে অমন একখানি punch দিয়ো না হে। কে কখন অক্কা পেয়ে তোমায় মক্কা পাঠাবে।"

স্নেহময় খোশ মেজাজে ছিল। অশোকা তাকে কথা দিয়েছে। তারাপদকে অভ্যর্থনা করে বলল, "আমি ত শুধু তোমার টুঁটিটা একটুখানি টিপে ধরেছিলুম। ওকে ত punch করা বলে না।"

"যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি। আমি ত তোমার মত বিখ্যাত বক্‌সার নই, আমি ওকেই বলে থাকি punch। কিন্তু শোন হে, আমার একটু উপকার করতে পার?" স্নেহময় বলল, "নিশ্চয়। যদি আকাশের চাঁদ পাড়তে না বল।"

"না, আমাদের মত গরিব মানুষের ও দুরাশা নেই। চাঁদ পাবে তোমরাই। আপাতত আমাকে একখানা পাসপোর্ট পাইয়ে দাও হে।"

"কেন? কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছ? আমার বাগ্‌দানের আগে

তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। তুমি গেলে আমার Bestman হবে কে?" স্নেহময় কখনো এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে না।

"শুনে খুশি হলুম তোমার বাগ্‌দানের বার্ত্তা, আশা করি দেরি নেই। ততদিন যদি থাকি ত অবশ্য যোগ দেব, আমাকে না ডাকলেও আমি আসবই। কিন্তু ইতিমধ্যে একটু দয়া কর। স্যর অতুল তোমাকে চেনেন, মিঃ মল্লিকও তোমার পিতার বন্ধু বলে শুনেছি। ওঁরা যদি এক লাইন লিখে দেন তা হলে আমার পাসপোর্ট পেতে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।"

'কেন? হয়েছে কী?"

"হবে আর কী। আমি যে একজন কমরেড।"

"I see। আচ্ছা, আমি স্যর অতুলকে বুঝিয়ে বলব। তোমার যদি বিশেষ তাড়া না থাকে তা হলে একদিন ডিনারে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমার শাশুড়ী—"

"ভাই, তোমার যখন এমন শাশুড়ী ভাগ্য তখন তুমি আজ এখনি আমার উপকার করতে পার। তুমি ওঁকে, উনি স্যর অতুলকে ও তিনি পাসপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করলে মোট পনেরো মিনিটে কাজ হাসিল হবে। ততক্ষণ আমি বসে বসে তোমার ড্রেসিং গাউনটা পরখ করি। খাঁটি জিনিস হে। কোথায় কিনলে?"

কাকে দিয়ে কোন কাজ সমাধা হয় তারাপদ তা অভ্রান্তরূপেই জানত। স্নেহময়ের দৌত্যে সেই দিনই পাসপোর্ট পাওয়া গেল। দক্ষিণাস্বরূপ তারাপদ স্নেহময়ের ড্রেসিং গাউনটি হস্তগত করল। "ওহে, একদিনের জন্যে এটি ধার দিতে পার? কালকেই—বুঝলে?"

স্নেহময়ের তখন দিলখুশ্‌। সে শুধু ভাবছে তার বাগ্‌দানের কথা। বলল, "কাল কেন, যেদিন তোমার সুবিধা।"

তারাপদ যেদিন অদৃশ্য হল তার বহুপূর্ব্বেই তার অস্থাবর সম্পত্তি দেশান্তরিত হয়েছিল। সঙ্গে একখানি অ্যাটাশে কেস নিয়ে সে সহজ ভাবে বাসার বাইরে গেল। কেউ অনুমানও করল না যে লোকটা ফ্রান্সে যাচ্ছে।

রাত্রে ফিরল না। তাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। পরদিনও কেউ সন্দেহ করত না, কিন্তু পুলিশের লোক এসে খোঁজ করতে সুরু করল।

তারপর কী করে যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, এক একে বাড়ীওয়ালা কসাই মুদি দুধওয়ালা ইত্যাদি যাবতীয় পাওনাদার এসে কলরব বাধাল। তখন কমরেডদেরও মনে পড়ল যে বেসমেট মেরামত হবার নামে বড় বড় স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক বাসা থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। যাদের টাকা ছিল তারাপদর কাছে তারা হিসাব করে দেখল যে প্রায় হাজার খানেক পাউণ্ড একা কমরেডদেরই। চাইদাবী, আত্মাপ্রসাদ এরা বাসা ছেড়েছিল বটে কিন্তু টাকা ফেরৎ নেয়নি, সেই টাকা ফেরার হয়েছে দেখে তাদের টনক নড়ল। কমিউনিস্ট হলেও তারা টাকার শোকে পুলিশের কাছে হাটাহাটি অভ্যাস করল।

বাদল অন্যমনস্ক ছিল, জানত না কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। ব্রনস্কিদের ফ্ল্যাটে তার মূর্তি নির্মাণ শেষ হলেও কিসের আকর্ষণে সে পুনঃপুনঃ সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসত, বুঝি সাধু যে জ্ঞান সন্ধান। তার হোঁশ হল যখন পুলিশের লোক তার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাসী করে গেল। পেল না বিশেষ কিছু। তারাপদর ঠিকানা বাদলের ঘরে থাকবে তারাপদ এত কাচা ছেলে নয়। কিন্তু বাদলের আক্কেল হল। সে খবর নিয়ে টের পেল তার স্যুটকেস ইত্যাদি তারাপদর মত উধাও। তার টাকা ত গেছেই খাতা কেতাব চিঠি পত্র সব গায়েব।

৩

বাদল মাথায় হাত দিয়ে বসল। বই চুরি গেলে কেনা যায়, কিন্তু বাদলের কোনো কোনো বই দুর্মূল্য। বই তবু ব্রিটিশ মিউজিয়মে গেলে পড়তে পাওয়া যাবে কিন্তু বাদল তার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের খেই খুঁজে পাবে কোথায়, তার নোটগুলি যদি না মেলে? প্রতিদিন যখন যে ভাবনা মনে উদয় হত এক এক টুকরো কাগজে টুকে রাখত। কখনো খবরের কাগজের মার্জিনে, কখনো বাসের টিকিটের পিঠে। এছাড়া তার এক রাশ খাতাও ছিল তাদের পাতায় পাতায় কত রকম আইডিয়া। এ সব মাল মসলা তারাপদর কাজে লাগবে না, কিন্তু যদি কোনো ভাবুকের হাতে পড়ে তবে বাদলের আইডিয়াগুলি পরের নামে প্রচারিত হবে। চিন্তা করে মনন

বাদল আর নাম করে অমর হ'ল অন্য কোনো ভাবুক। বাদলের কান্না পায়।

"আমার স্বাক্ষর। আমার স্বাক্ষর।" বাদলের চোখে বাদল নামে। "আমার চিন্তার অঙ্গে আমার স্বাক্ষর রয়েছে, আমার খাতার পাতায় আমার অদৃশ্য স্বাক্ষর। আমার নাম চুরি গেল যে। আমার নাম।"

কিন্তু এ দহনও অসহন নয়। বাদল যদি বেঁচে থাকে তবে আরো কত কী লিখবে। তার মগজ যত দিন আছে তার কাগজ চুরি গেলেও সর্ব্বনাশ হয়নি। কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়েছে তার চিঠিগুলি গিয়ে। ওসব চিঠি সে, কাকে দিয়ে আবার লেখাবে। তার অগণ্য ভক্ত তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করেছে, সে সব প্রশ্নের সে রাত জেগে জবাব লিখেছে। ভক্তির সঙ্গে প্রীতিও পেয়েছে অশেষ, প্রীতির সঙ্গে প্রশস্তিও। কোনো কোনো চিঠি মনীষীদের লেখা, বাদলের প্রশ্নের উত্তর। যাঁদের অটোগ্রাফ উঁচু দরে বিকায় তাঁদের স্বহস্তের লিপি। হায়, তারাপদ কি এগুলির মর্ম্ম বুঝবে। তারাপদর যেমন বিদ্যা সে ডি,এইচ, লরেন্স ও টি, ই, লরেন্স-এর পার্থক্য জানে না।

চিঠির শোকে বাদল পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল। মাথার চুল যে ক'টি অবশিষ্ট ছিল সে ক'টি প্রায় নিঃশেষ হ'তে চলল।

"আমার চিঠি। আমার চিঠি কোথায় পাব। সে সব দিন কি আর ফিরবে, সে সব চিঠি কি কেউ লিখবে।" বাদল যে কেন ওসব চিঠি নিজের কাছে না রেখে গুদাম ঘরে পাঠাল এর দরুণ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করল।

"Are there two such fools in the world?" বাদল সুধাল রাওয়ার্থকে।

রাওয়ার্থ সব শুনে বললেন, "It seems there are."

তাঁরও সর্ব্বস্ব গেছে। বাদলের যা গেছে তা ব্যক্তিগত, কিন্তু রাওয়ার্থের কাছে অনেক রাজনৈতিক দলিল ছিল, ওসব ইতিহাসের সামিল। গত জেনারল ষ্ট্রাইকের সময় রাওয়ার্থ ছিলেন ধর্ম্মঘটীদের পক্ষে, তখন তাঁর হাত দিয়ে বহু কাগজ পত্র চলাচল করেছিল। রাওয়ার্থ কোনোটার নকল, কোনোটার আসল নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পরে ইতিহাস লিখতেন।

"কিন্তু সেন," বাওয়ার্স বাদলের হা হুতাশ এক নিশ্বাসে থামিয়ে দিলেন, "আমি কি জানতে পারি কখন তুমি যাচ্ছ?" বাদল যেন আকাশ থেকে পড়ল। "যাচ্ছি, কেন, যাব কোথায়?"

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে একে একে প্রত্যেকেই গেছে কিম্বা যাচ্ছে? এ বাসা কুণ্ডুর নামে ইজারা। ভাড়া বাকী পড়েছে।"

বাদল অবশ্য লক্ষ্য করেছিল যে সাকলাতওয়ালার পরাজয়ের পর থেকে বিস্তর কমরেড ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তা হলেও বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রশ্ন ওঠেনি। বাড়ী ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক, সে সুধীদাকে কথা দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে এখানে এসে থাকতে পারে। সে ত এমন-কোনো আভাস পায়নি যে তারাপদ অন্তর্ধান করবে।

"আমি যে ভয়ানক অপ্রস্তুত হব, বাওয়ার্স," বাদল বলল, "যদি এ বাসা একেবারে খালি হয়ে যায়। আমি যে একজনকে এখানে এসে থাকতে বলেছি। আমার সেই বন্ধুর কাছে এখন মুখ দেখাব কী করে?"

"কুণ্ডু আমাদের সকলের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। লজ্জার বাকী আছে কী?"

এ বাড়ীর আরামের পর এমন আরাম আর জুটবে না। তা বাদল অন্তরে অন্তরে জানত। তাড়ার দোষ থাকুক, তারাপদ মানুষকে আরামে রাখত। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বড় বড় হোটেলেও নেই। অথচ তারাপদর চার্জ মানুষের অসাধ্য নয়। আছে, তারাপদর পক্ষে বলবার আছে। লোকটা জাঁহাবাজ হলেও শক্তিমান, এই ত সাজানো বাড়ী পড়ে রয়েছে। চালাক দেখি কেউ? পালাতে সবাই ওস্তাদ। দায়িত্ব নেবার বেলায় একা তারাপদ। সর্দার বটে!

"আচ্ছা, বাওয়ার্স, আমরা কি একটা কমিটি করে এ বাসা চালাতে পারিনে?"

"না, সেন। দারুণ ঝঞ্ঝাট।"

"আচ্ছা, একটা সোভিয়েট করে?"

"না, সেন। সোভিয়েট করলেও এত ঝঞ্ঝাট পোষাবে না।"

বাদল উষ্ণ হয়ে বলল, "সোভিয়েট করে একটা বাসা চালাতে পার

না, স্বপ্ন দেখছ একটা রাষ্ট্র চালাবার। বাওয়ার্স, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"আমি লজ্জিত নই। বাসার সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা মন্দ উপমা।"

বাদল বাগান্বিত হয়ে বলল, "কোণঠাসা হলে তোমরা ওকথা বলবেই। কিন্তু তথ্য হচ্ছে এই যে একা কুণ্ডু যা পারত একটা সোভিয়েট তা পারে না। স্টালিন যে ডিক্‌টেটর হয়েছে তা শুধু এইজন্যে যে সোভিয়েট যারা করেছে তারা তোমার আমার মত অকেজো, অপদার্থ, ভাবপ্রবণ, তার্কিক, কলহপ্রিয়, পলায়নতৎপর।"

বাওয়ার্স মৃদু হেসে বললেন, "হয়েছে না আরো আছে? শেষ কর তোমার ফর্দ।"

"দায়িত্বহীন, দলাদলির দালাল, স্বার্থপর, যে যার খুঁটি আগলাতে ব্যস্ত, কর্তার অভাবে দিশাহারা।"

"বলে যাও, বলে যাও।"

বাদল উত্তেজনার মুখে বলে বসল, "ট্রট্‌স্কির প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

"এইবার ধরা পড়েছ, সেন।" বাওয়ার্স টেবল চাপড়ে হো হো করে হাসলেন। "ত্রনস্কির ওখানে শিক্ষা পাচ্ছ বেশ।"

বাদল ঘেমে উঠল। বাস্তবিক, ত্রনস্কির শিষ্যাই বটে। তবু গম্ভীর ভাবে বলল, "হয়ত আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু এটা ত মানবে যে যারা একটা বাসা চালাতে পারে না তারা একটা রাষ্ট্রের ভার নিলে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বে। না ঝঞ্ঝাট কি কেবল বাসায়?"

"পয়েণ্ট তা নয়।" বাওয়ার্সকে তর্কে হারানো দুষ্কর। "পয়েণ্ট হচ্ছে এই যে এ বাসার দেনা দাঁড়িয়েছে অনেক। দেনা শোধ করবে কে? তোমার আমার দু'জনের একটা সোভিয়েট করা সহজ। কিন্তু তুমি আমি কি নিজের পকেট থেকে সমস্ত দেনাটা শোধ করতে পারি? তোমার বন্ধু যদি আসেন তিনিও দেনার জন্য দায়ী হবেন, অথচ দেনা ত তাঁর জন্যে করা হয়নি। কেন তিনি আসতে চাইবেন, যখন শুনবেন দেনায় দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে?"

বাদল চিন্তিত হল। তাই ত। দেনাটিও সামান্য নয়।

"তা হলে বুঝতে পারছ, সেন, সোভিয়েট করলে সোভিয়েট এই দেনাটি বহন করে তোমাকে আমাকে ও আমাদের মত দু'চারজনকে দোহন করতে বাধ্য হবে। দেনা শোধ করার অন্য উপায় নেই। যদি আমরা কলমের এক খোঁচায় সমস্ত দেনাটা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারতুম, যদি পাওনাদারকে দরজা থেকে হাঁকিয়ে দিতে পারতুম তা হলে আমাদের সোভিয়েট গঠন করা সার্থক হত, যেমন রাশিয়ায় হয়েছে। সেখানেও পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের ঋণ অস্বীকার করা হয়েছে। নইলে সেই ঋণের দায়ে সোভিয়েট ব্যর্থ হত।"

বাদল বলল, "ঠিক। কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে সব দেনা করেছে তোমার সোভিয়েট—যদি কোনো দিন এ দেশে সোভিয়েট হয়—সে সব দেনা মুছে ফেলবে? সে কি সম্ভব?"

"যদি সম্ভব না হয় তবে সোভিয়েট ব্যর্থ হবে, এই পর্য্যন্ত লিখে দিতে পারি। যাতে সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।"

"বৃথা চেষ্টা, রাওলার্স।" বাদল প্রত্যয়ের সহিত বলল। "পরিষ্কার স্লেট কেউ কোনো দিন পায় নি। তোমাদেরও ঘাড়ে চাপবে পর্ব্বতাকার ঋণ। সে ঋণ শোধ না করলে পাওনাদারের দল তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবে, পরাজিত হলে তোমাদের সঙ্গে অসহযোগ করবে। তোমরা অনশনে মরবে।"

রাওলার্স বাদলকে একটা সিগরেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আশা করি আমরা অনশনে মরার আগে অপর পক্ষকে মরণের মুখে পৌঁছে দিয়ে যাব। আমরা আক্রমণ করব, সেন। আক্রমণও আমাদের শাস্ত্রে আছে।"

বাদল ঠিক এই জিনিষটিকে ভয় করত। শ্রেণী সংঘর্ষ। যুদ্ধ বিগ্রহ। এসব যদি অনিবার্য্য হয় তবে কি মানবজাতি নির্ব্বংশ হবে না? মানবজাতির নির্ব্বাণ ঘটলে কাকে নিয়ে জগতের বিবর্ত্তন, কাকে নিয়ে প্রগতি, কার জন্যে সভ্যতা, কার জন্যে সংস্কৃতি? ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এদের বিরোধ যে মানববংশী।

বাদলের উক্তি শুনে বাওবার্স বললেন, "এর উত্তরে লেনিন যা বলেছিলেন তাই শেষ কথা। সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যদি পৃথিবীর বারো আনা মানুষকে মরতে ও মারতে হয় তা হলেও মাত্র চার আনা মানুষের জন্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

"যদি ষোল আনা মানুষই মরে—"

"তা হলেও জগতের শেষ দুটি মানুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে পরস্পরকে হত্যা করবে, কিছুতেই বৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি করবে না।"

বাদল এসব তত্ত্ব এই নতুন শুনল তা নয়। এ বাসার এই হচ্ছে ডাল-ভাত। তবে এর সঙ্গে সত্যিকার ডালভাত ছিল বলেই এ সব পেটে সইত।

"তুমি কি তবে বলতে চাও, বাওবার্স," বাদল করুণ স্বরে বললো, "বিরোধ অনিবার্য ?"

"অনিবার্য।"

"কী করে এতটা নিশ্চিত হলে ? যদি ক্যাপিটালিস্টরা স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দেয়।"

"স্বেচ্ছায় ?" বাওবার্স একটি চোখ বন্ধ করে অপর চোখে হাসলেন। "স্বেচ্ছায় যেমন রাশিয়ার জার সিংহাসন ছাড়লেন ? অসম্ভব নয়। তবে তার আগে আমাদেরও ইচ্ছাপ্রয়োগ করাতে হবে, নইলে ওদের ঐ স্বেচ্ছাটুকু অনিচ্ছায় পর্য্যবসিত হবে।"

"আমার মনে হয়," বাদল গবেষণা করে, "উভয় পক্ষে সম্মানজনক সন্ধি সম্ভব।"

"তুমি," বাওবার্স বললেন, "স্ত্রী উইলে আস্থাবান। আর আমি বদ্ধ ডিটারমিনিস্ট। যা হবার তা হবেই, কেউ ঠেকাতেও পারবে না, কেউ এড়াতেও পারবে না। যাদের ঘরে টাকা আছে তারা তা সুদে মুনাফায় খাটাবেই। যাদের মারফৎ খাটাবে তারা তা অন্যত্র খাটাবার পরিসর না পেলে যুদ্ধের সম্ভার নির্মাণে খাটাবে। যুদ্ধের সম্ভার জমতে জমতে যুদ্ধের হেতু জমবে। সহসা একদিন যুদ্ধ বেধে

যাবে—শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। যুদ্ধে যে দেশ বিব্রত হবে সে দেশে শ্রেণী সংগ্রাম বাধবে, যেমন গত যুদ্ধের সময় রাশিয়ায়। এবার কেবল একটি দেশে নয়, সব দেশেই, কেননা বিব্রত হবে সব দেশ।"

বাদল বলল, 'ওটা তোমার wishful thinking"

রাওয়ার্স বললেন, "এটা বিশুদ্ধ জ্যোতিষ। যেমন চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ। প্রচলিত ব্যবস্থা জনসাধারণের অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শুধু এক আধটি দেশে নয়, সব দেশে। তবু মাতব্বরদের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তন না করলেও চলে. জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধে লিপ্ত করে সুদ মুনাফা দুই হাতে লুট করলেও চলে, জনসাধারণকে পরস্পরের দ্বারা উজাড় করিয়ে বেকারসংখ্যা নির্মূল করলেও চলে। সেন, এ ধারণা ইতিহাসে অসিদ্ধ। এ বাসা ভাঙবেই। একে তুমি খাড়া করে রাখতে পারবে না। কমিটি দিয়েও না, সোভিয়েট দিয়েও না। আর একটি যুদ্ধ বাধালেই এর পতন অনিবার্য্য।"

"কিন্তু যুদ্ধ যে মানবধ্বংসী। তুমি নিজেই ত বললে যে জনসাধারণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত করে উজাড় করানো ভালো নয়।"

"ভালো নয়, কখন বললুম? ভালো মন্দের প্রশ্ন উঠছে না, সেন। যা ঘটবেই তা ভালো নয় বলে অঘটিত থাকবে না। তুমি কি মনে করেছ ঘটনার স্রোত উল্টো দিক বইবে, যদি শ্রমিকদের দু'চারটে খুচরা সুবিধা দেওয়া হয়? তাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিতে পার, তাদের জমানো টাকা কারবারে খাটিয়ে তাদের মুনাফা জোগাতে পার, তাদের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতে পার, সব পার, কিন্তু একটি জিনিষ পার না। পার না যুদ্ধ রোধ করতে। আর যুদ্ধ যদি একবার বাধে তবে সে শুধু আমাদেরই সুবিধা করে দিয়ে যাবে—কমিউনিস্টদেরই সুবিধা।"

বাদল অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, "তোমরা বোঝ কেবল একটি কথা। তোমাদের সুবিধা। কিসে মানবের দুঃখমোচন

হঙ্ক সে ভাবনা তোমাদের নেই।' হয়ত ছিল গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে নিবেছে। এখন তোমাদের একমাত্র স্বপ্ন কিসে তোমাদের সুবিধা হয়। তোমাদের ইতিহাসের, তোমাদের জ্যোতিষের। কিসে তোমাদের শ্রীহস্তে power আসে। কেমন?"

বাওয়ার্স আরক্ত হয়ে বললেন, "অমন ভাবে বললে কথাটা ভোঁতা শোনায় কিন্তু আমি মানছি কথাটা সত্য, আমরা চাই power, কেন না আমরাই ওর সদ্ব্যবহার করতে পারি, অন্য কেউ পারে না।"

বাওয়ার্স ভাবাকুল স্বরে বললেন, "সেন, পৃথিবীতে স্তরে স্তরে তেল, লোহা, কয়লা, কাঠ, ধান, গম, কতরকম ভোগ্য সম্পদ আছে ধরণীতে, তার হিসাব নিয়ে তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলে তার দ্বারা সকলের সব দুঃখ যাবে। কেউ অভুক্ত থাকবে না, কেউ অপরিহিত থাকবে না। সকলের শিক্ষাদীক্ষা চিকিৎসা জুটবে। সকলে গাড়ীঘোড়ায় চড়বে, ভালো বাড়ীতে থাকবে। সর্ব্ব ধনে ধনী যে ধরণী তার বক্ষে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কেন সর্ব্বহারা? কারণ যে ব্যবস্থা এত দিন চলে আসছে সে ব্যবস্থার কোথাও একটা মারাত্মক ভুল আছে। সে ভুল যারা চোখে দেখতে পায় না তারা অন্ধ। সেই সব অন্ধের দ্বারা নীয়মান হলে পৃথিবীর আজ এই দশা। সেই সব অন্ধ একদিন মানবজাতির রথ পরিচালনা করে এমন গর্ত্তে পড়বে যে সেখান থেকে আর উদ্ধার নেই। তখন আমাদের যদি শক্তি থাকে আমরাই ঠেলে তুলব। যে ক'টি মানুষ বেঁচে থাকবে সেই ক'জনকে নিয়ে নবীন ব্যবস্থার পত্তন হবে। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে মানবসংখ্যা আরো কমবে বলে কাতর হব না, অকাতরে কমাব।"

বাদল স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "তোমার মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আমার নেই। আমি যা বলি তা ভোঁতা।"

"কিন্তু আমি যা বললুম তা কি সত্য বলে মনে হয় না?"

"অর্দ্ধ সত্য। কেন না মানবের প্রতি ওদের যেমন দরদ নেই তোমাদেরও নেই দরদ। ওরা যেমন ওদের ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মরতে ও মারতে তোমরাও তেমনি তোমাদের

ব্যবস্থাকে বাধাহীন করবার জন্যে মানুষকে পাঠাবে মারতে ও মরতে। মানুষের জন্যে ব্যবস্থা না ব্যবস্থার জন্যে মানুষ?"

"মানুষের জন্যেই ব্যবস্থা, কিন্তু তেমন ব্যবস্থাকে বাধা মুক্ত করাও আবশ্যক।"

"বাধা," বাদল বলল, "বাধা কি একটি? পরিশেষে ট্রটস্কি।"

"হাঁ, প্রয়োজন হলে তাকেও সরাতে হয়।"

"ঐ করেই উৎসন্ন যাবে রাশিয়া। আর তোমাদের যদি মানুষের প্রতি দরদ না জন্মায় তবে তোমরাও।"

রাওয়ার্স উঠতে যাচ্ছিলেন, বাদল তাঁকে আর একটু খানিকক্ষণ বসাল। "এ বাসা যদি ছাড়তে হয় কোথায় যাব জানিনে। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।"

"আমারও সেই ভাবনা। ফিরে দেখা হবে মাঝে মাঝে। যদিও আমাদের মিল তত নয় অমিল যত, তবু বাক্যালাপের দ্বারা মনটা পরিষ্কার হয়।" রাওয়ার্স বাদলকে আর একটা সিগরেট নিতে বললেন। সে নিল না।

বাদল দুই হাত দুই গালে চেপে কী যেন ভাবছিল। বলল, 'সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, আধুনিক যুগের যাবতীয় ইজম, প্রত্যেকের যাচাই হবে একই নিকষে। সে নিকষের নাম দুঃখমোচন। তুমি ধরে নিয়েছ যে দুঃখ প্রধানতঃ অন্নবস্ত্রের দুঃখ। পৃথিবী যখন অন্নপূর্ণা তখন কেন অন্নাভাব? এই প্রশ্ন থেকে তোমার মতবাদ সুরু। আমার কিন্তু তা নয়। আমার কাছে দুঃখ প্রধানতঃ অপচয়ের দুঃখ। মানুষ যখন এত বুদ্ধিমান, এত হৃদয়বান তখন দিকে দিকে কেন এত অপচয়? প্রাণের অপচয়, আয়ুর অপচয়, যৌবনের অপচয়? ধনের অপচয় ত বটেই, যারা নির্ধন তারাও অপচয় করছে তাদের সামর্থ্য ও সময়। কী করে বাঁচতে হয় তাই আমরা জানিনে, কী করে মরতে ও মারতে হয় তাই এত কাল শিখছি। তুমি ইতিহাসের দোহাই দিচ্ছ। ইতিহাস আমাদের কি এই শিক্ষা দেয় না যে মারামারি কাড়াকাড়ি করে কারো মঙ্গল হয়নি? ওটা অপচয়?'

"আমি তোমার সঙ্গে একমত।" বাদলকে স্তম্ভিত করে দিলেন বাওয়ার্স। "কিন্তু যাই ডিয়ার চ্যাপ, এই প্রচলিত ব্যবস্থা রসাতলে চলেছে। একে তলিয়ে যেতে দাও, বুদ্ধিমান। এর স্থলে অভিষিক্ত হবে নবীন ব্যবস্থা, নূতন শৃঙ্খলা। তাকে রক্ষা কর, হৃদয়বান।"

বাদল দুই হাতে দুই বাহু পিষতে পিষতে বলল, "ভগবান আছেন কিনা জানিনে। কিন্তু আমি ত আছি। এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, বাওয়ার্স দুঃখমোচনের কষ্টিপাথরে যা সোনার দাগ রেখে যাবে না তাকে আমি কোনোমতেই স্বীকার করব না, সর্বতোভাবে বাধা দেব। না ক্যাপিটালিজম, না কমিউনিজম কোনোটাই ইতিহাসের লিখন নয়। যুদ্ধ যাতে না বাধে সেই হবে আমার একান্ত প্রয়াস, কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে এমন কিছু আমি উদ্ভাবন করব যার দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হবে, সমাজের হবে আমূল পরিবর্তন। কী করে তা সম্ভব, তা আমি জানিনে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমি যুদ্ধেরই ফল চাই আর বিনা বিপ্লবে কমিউনিজমের।"

"প্রলাপ।" বলে বাওয়ার্স গা তুললেন।

৫

যুদ্ধের নাম শুনলে বাদল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানব সে, মানবের প্রতি তার দায়িত্ব আছে, সে ত দায়িত্বহীন হতে পারে না। যে আগুনে পাড়াপড়শী সকলেরই ঘর পুড়বে, পুড়ে মরবে শিশু ও নারী, সে আগুন যারা লাগাবে তারা যদি হয় নরপিশাচ তবে সে আগুন লাগলে যাদের সুবিধা তারাও নরাধম। যার অন্তরে লেশমাত্র মানবতা আছে সে বলবে, চাইনে সুবিধা চাই শান্তি।

অথচ শান্তি বলতে পচা পুকুরের বদ্ধ জল ও পুঞ্জীভূত পাঁক নয়। শান্তি হবে বেগবান স্রোত, মুক্ত ধারা। শান্তির মধ্যে যুদ্ধের ভাব থাকবে, থাকবে শৌর্য্য, থাকবে সাহস, থাকবে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বাদল অহিংসাবাদী নয়, প্রয়োজন হলে হত্যা করতেও সে পরাঙ্মুখ হবে না। কিন্তু আধুনিক যুগের মারণাস্ত্রগুলি দিন দিন যেমন

উন্নত হচ্ছে সে উন্নতি যুদ্ধকে দিন দিন এগিয়ে আনছে, কেননা অস্ত্রপরীক্ষার অন্য কোনো পন্থা নেই। বাদলের বন্ধু কলিন্স এরোপ্লেনের পাইলট হতে চায়, কারণ সে পরীক্ষা করতে চায় এরোপ্লেনগুলো যুদ্ধকালে কার্য্যকরী হবে কি না। ক্রমে এক দিন সেই কলিন্স কেবলমাত্র পাইলট হয়ে তুষ্ট থাকবে না, বোমারু হতে চাইবে। পরীক্ষা করতে চাইবে বোমাগুলো যুদ্ধকালে কার্য্যকরী হবে কি না। এইভাবে পরীক্ষা করতে করতে পরম পরীক্ষার পিপাসা জাগবে। বজ্রপাতের পিপাসা। তখন 'প্রয়োজন হলে হত্যা করব' এ নীতি কোথায় উড়ে যাবে। এর বদলে উদয় হবে "জয়ের জন্য হত্যা করব" এই নীতি। এমনি করে মানুষ মানুষকে উজাড় করবে। মুখে আওড়াবে, "জয়ের জন্যে।" যেই জিতুক না কেন, কোটি কোটি মানুষ মরবে, মরণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। জয়ের নেশা যেমন ছুটো ষাঁড়কে পেয়ে বসলে ছুটোকেই সাবাড় করে তেমনি ছুটো দেশকেও, ছ'দশ দেশকেও। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সমগ্র পৃথিবীকেও। না, বাদল অহিংসাবাদী নয়, কিন্তু মাত্রাবাদী। হিংসা যদি মাত্রা না মানে, প্রয়োজনের সীমানা না মানে, তবে যে ভীষণ অপচয় হয় তা মানবদেহের রক্তাপচয়ের মত প্রাণঘাতী। শরীরের নখ কাটা, চুল ছাঁটা মাঝে মাঝে প্রয়োজন। চিকিৎসকের নির্দেশে অস্ত্রোপচারও কদাচ কখনো প্রয়োজন। কিন্তু নেশার ঘোরে নিজের কণ্ঠচ্ছেদ বা বক্ষভেদ যে আত্মহত্যা।

আপাততঃ যুদ্ধের উপর রাগ করে বাদল বই খাতা চিঠির শোক ভুলল। চলল ব্রনস্কির ওখানে, ব্রনস্কি ছিলেন না। ছিলেন তাঁর তরুণী ভার্য্যা। তিনিই প্রথম বাদলকে নাম ধরে ডাকতে সুরু করেন।

"অলগা,' বাদল ক্লান্ত সুরে, "আমি যে প্রায় গৃহহারা।"

বাদলের মুখে বিবরণ শুনে অলগা বললেন, "বাদল, তুমি ত জান, একটি জায়গা আছে যেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

বাদল বলল, "জানি। রাশি রাশি ধন্যবাদ। কিন্তু আমার যে কী গভীর তৃষা।"

তৃষার কথায় মাদাম ঠাওর্যালেন বাদলের তেষ্টা পাচ্ছে তিনি বললেন, "চা, না শীতল পানীয় ?"

বাদল তার দিকে চেয়ে বলল, "দিতে মর্জি হয় ত দিতে পারো শীতল চা। কিন্তু তাতে আমার তৃষা যাবে না। এ আমার কিসের তৃষা বলব ? জনতার সঙ্গে এক হয়ে যাবার তৃষা। আমার স্বাক্ষর গেছে, গৃহ নেই। এখন আমি চাই নামহীন গৃহহীন অচিহ্নিত জীবন, জনপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত। বোঝাতে পারছিনে, অলগা। বোঝার মত চেপে বসেছে বুকে নতুন একটা ভাব, নিঃশ্বাস ফেলছে বুকে নতুন একটা অভাব।"

এই বলে বাদল অন্যমনস্ক হল। অলগাও উঠে গেলেন।

বাদল ভাবতে থাকল, ও বাসা থেকে যেখানেই যাক টাকা লাগবে। টাকার জন্যে বাবাকে লিখতে রুচি হয় না, কোন অধিকারে নেবে ওঁর টাকা। যদি উনি শুনতে পান বাদল কোথায় ঘুরছে, কী করছে, তাহলে আপনাআপনি টাকা বন্ধ করবেন। অথচ বাদলের উপার্জন এক কপর্দক নয়। লিখে যদি বা কিছু পেত, খাতা চুরি যাবার পর সে আশাও নেই। বাদ। তা হলে করবে কী ? কার কাছে হাত পাতবে ? কোন অধিকারে ? একটা চাকরি—না, চাকরি করতে আগ্রহ নেই, যদি না সে চাকরি হয় স্বাধীনতার নামান্তর। চিন্তার স্বাধীনতাকে বাক্যের স্বাধীনতাকে বাদল স্বাধীনতা বলে।

"ধন্যবাদ, অলগা। তোমার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে, জানিনে। তোমার সেই মূর্তি নিয়ে যে কী করব, কোথায় রাখব, সেও এক সমস্যা। কেননা," বাদল তার নিজের মনে যা অস্পষ্ট ছিল তাকে যুগপৎ স্পষ্ট করল ও ব্যক্ত করল, "আমি হয়ত জিপ্‌সীর মত পথে পথে বেড়াব।"

অলগা বিশ্বাস করলেন না, মিষ্টি হাসলেন। বাদলকে এতদিন সামনে বসিয়ে অধ্যয়ন করছেন, তার মধ্যে যে একজন জিপ্‌সী আছে তা কী করে বিশ্বাস করবেন ? বাদল চা চেয়েছিল, কিন্তু একবার মুখে ছুঁইয়ে আর মুখে দিল না।

"তুমি যদি অন্য কোথাও স্থান না পাও", তিনি পুনরুক্তি করলেন, "তবে একটি জায়গা আছে সেখানে তুমি সব সময় স্বাগত।"

"কিন্তু আমি যে রিক্ত, আমি যে কপর্দকহীন।"

এ কথাও তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "সত্যি?" তাঁর ভ্রূভঙ্গীটি বাদলের ভালো লাগল।

"সত্যি।" বাদলও তাঁর অনুকরণ করল।

'তা হলেও আমার নিমন্ত্রণ রইল। তার পর হেসে বললেন, "তুমি কি জান না যে আমরাও নিঃস্ব?"

বাদল জানত। সেইজন্যেই ত মূর্তির অর্ডার দিয়েছিল।

ব্রনস্কি এসে পড়লেন। এই গ্রীষ্মকালেও তাঁর পায়ে জুতোর উপর স্প্যাট্স্। দস্তানা একটি পকেটে, একটি হাতে। পরিপাটী সম্ভ্রান্ত পোশাক, চোখে সোনার চশমা। চুলগুলি কাঁচাপাকা, কিন্তু যত্ন করে কাটা।

"আহ্।' হাত বাড়িয়ে দিলেন বাদলের দিকে, "সুখী হলুম তোমাকে দেখে। কতক্ষণ এসেছ?"

"কী জানি।" বাদলের খেয়াল ছিল না, সে যেমন অন্যমনস্ক।

"বেশীক্ষণ না।" মাদাম উত্তর দিলেন।

"হনরেড ব্রনস্কি', বাদল যেন এতক্ষণ তর্কের সুযোগ অন্বেষণ করছিল, "আপনি যে ডিটারমিনিস্ট তা অবশ্য জানা আছে আমার। তবু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি মনে করেন যুদ্ধ অনিবার্য্য?"

"অন্য রূপ মনে করে এমন কি কেউ আছে?"

"কেন, আমি। আমি ত মনে করি অনিবার্য্য যারা বলে তাদের কিছু না কিছু স্বার্থ বা সুবিধা আছে।"

"অন্যের উপর দোষারোপ করে কী হবে? যা অনিবার্য্য তা অবশ্যম্ভাবী। কবে হবে সেই একমাত্র জিজ্ঞাস্য।"

বাদল গরম হয়ে বলল, "জ্যোতিষে লেখা নেই?"

ব্রনস্কি স্ত্রীকে পানীয় আনতে বলে বাদলের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি আমার কথা শুনতে চাও, না তোমার কথা শোনাতে চাও?

আমি বলছি, শোন। যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার তা আমি আন্দাজে বলতে পারব না।"

"আর বিপ্লব?"

"বিপ্লবও বাধবে। কিন্তু ওর পরিণাম সম্বন্ধে আমি সংশয়ী। তুমি ত জান, আমার মতে জনগণ যতদিন না দৃঢ়সংকল্প হয় ততদিন বিপ্লব একটা চোরাবালি। ওতে কমিউনিজম ভিত্তিভূমি পায় না, পায় তার কবর। রাশিয়ায় যা ঘটছে তা কমিউনিজমের অন্ত্যেষ্টি। জনগণ দৃঢ়চেতা নয়, বোঝে না যে যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। বিপ্লব বাধলে অন্যান্য দেশেও স্টালিনের মত দৃঢ়চেতার খপ্পরে ক্ষমতা যাবে, জনগণ যে অক্ষম সেই অক্ষম।"

রাজা চার্লসের মুণ্ডুর মত স্টালিনের নাম যেমন করে হোক উঠবেই। বাদল বলল, "তা হলে আপনার মতে বিপ্লবও অনিবার্য, কিন্তু কমিউনিজম অবশ্যম্ভাবী নয়।"

ব্রনস্কি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন, "কমিউনিজমও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আগে যেমন আমার ধারণা ছিল বিপ্লব হলেই কমিউনিজম হবে এখন আমার সে ধারণা নেই। কমিউনিজম হবে, যেদিন জনগণ দৃঢ়পণ হবে। সেদিন যে কত দিন পরে তা আমি বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি যে, আসিবে, সেদিন আসিবে।"

"কিন্তু," বাদল বলল, "কমিউনিজমের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, আমার বিবাদ শ্রেণীসংঘর্ষের সঙ্গে। পার্লামেন্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে যদি কোনো দল কমিউনিজম প্রবর্তন করে তবে আমি আদৌ দুঃখিত হব না। কেননা পরবর্তী নির্বাচনে ও দলটিকে হারিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।"

ব্রনস্কি বললেন, "হায়, বাদল, সেইখানেই ত ফ্যাসাদ। আমি স্টালিনকে বললুম, আমাকে যদি গুলি করতে চাও, কর। এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক।" এই বলে তিনি সত্যি সত্যি কোট খুললেন। বাদল ত্রস্ত হয়ে ভাবল, তাই ত। গুলি করবেন নাকি নিজেকে? তা নয়। ব্রনস্কি বললেন, "অসহ্য গরম। আমি যদি কোট খুলি তোমার আপত্তি আছে, বাদল? তোমার, অনুগা?"

"এই আমি খুলে দিচ্ছি বুক। কিন্তু স্বীকার করব যে আমি জনগণের শত্রু নই। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমার মরণ ব্যর্থ কোরো না। আমি তোমার প্রতিপক্ষ, যেমন সব দেশেই থাকে অপোজিশন। শুনল স্টালিন ও কথা ?"

৬

বাদল স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। তার ইচ্ছা করছিল জিপসীর মত টো টো করে বেড়াতে। জিপসীর মত বেপরোয়া, জিপসীর মত চালচুলোহীন। কোথায় খাবে, কোথায় শোবে সে ভাবনা বাদলের নয়, বাদলের চিন্তা মানবনিয়তি।

"চললুম, কমরেড ব্রনস্কি। চললুম, অলগা।"

"সে কী, এরই মধ্যে ?" ব্রনস্কি তখনো তাঁর আখ্যায়িকা জমিয়ে তোলেননি। তারপরে কী হল তাই বলতে যাচ্ছেন। বাদলকে উঠতে দেখে সচকিত হলেন।

"আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।" বাদল তার সঙ্কল্প ব্যক্ত করল। "যাই, তার উদ্যোগ করিগে।"

"ঝাঁপ।" ব্রনস্কি বিস্মিত হলেন।

"হাঁ, কমরেড। আমাকে তলিয়ে যেতে হবে। তবে যদি এ সমস্যার তল পাই।"

"ঝাপ। সমস্যা।" ব্রনস্কি আরো বিস্মিত হলেন। "এসব কী, মঁসিয়ে সেন।" ভাবলেন ছোকরা হয়ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তাঁর ঘরণীর সঙ্গে নয় ত ?

"যুদ্ধ না করে যুদ্ধের ফল, বিপ্লব না করে বিপ্লবের ফল, কী করে লাভ করা যায় এই আমার সমস্যা।" বাদল তাঁকে আশ্বস্ত করল। "যদি সমাধান পাই তবে দুঃখ না দিয়ে দুঃখমোচন করা চলবে। নতুবা দুঃখমোচন করতে গিয়ে দুঃখবর্দ্ধন করা হবে, যেমন রাশিয়ায়।"

রাশিয়ার উল্লেখে ব্রনস্কি উল্লসিত হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন যে স্টালিন বিদ্যমান থাকতে রাশিয়ার দুঃখের পরিসীমা থাকবে না, কিন্তু বাদল তাঁকে বলবার সুযোগ দিল না।

এলিজাবেথ
আর
এনাকৃষী
ইংলণ্ডের বাণী এলিজাবেথ ছিলেন ফ্যাসানেব অগ্রদূতী। তাঁব বিশ্ব-বিখ্যাত সব পোষাক সেকালে চমক্‌প্রদ হ'লেও একালে অচল। ভাবতবর্ষেব শাড়ি কিন্তু চিবন্তনী—সর্বকালে এব সমান আদর। এনাকৃষী দেবীকে দেখুন—সাদা-সিদে একখানা মহালক্ষ্মীর সুতী শাড়িতে কী সুন্দরই না তাঁকে দেখাচ্ছে।
মহালক্ষ্মী
কটন্ মিলস্ লিমিটেড্
ম্যানেজিং এজেন্টস্ : এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
MCK 22

"চললুম, অলগা। তোমার নিমন্ত্রণ মনে থাকবে।" এই বলে বাদল দু'জনকে শুভরাই জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

এখন মার্গারেটকে খুঁজে পাব কোথায়? মার্গারেট আগেই ঝাঁপ দিয়েছে। "ঝাঁপ" শব্দটি তাঁরই। বাদলের কাছে তার একখানা পুরাতন চিঠি ছিল, চুরি যাবার মত চিঠি নয়, বাদল তা থেকে একটা ঠিকানা উদ্ধার করে সেখানে ও সেখান থেকে অন্য কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে শেষকালে নাগাল পেল মেয়ের। সেটা একটা রুটির দোকান, মার্গারেট সেখানে রুটি বেক করছিল।

"ও কে, বাদল নাকি? সুখী হলুম দেখে।" এই বলে মার্গারেট তাকে দোকানের সবলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

"মার্গারেট, তোমার কি আজ সময় হবে?" বাদল বলল কানে কানে। "কথা ছিল"।

বাদল 'পান' খেতে ভালোবাসে। অনুরোধ অগ্রাহ্য করল না। এত ঘুরে তার খিদেও পেয়েছিল।

বাদলের সমস্যা শুনে মার্গারেট বলল, 'কিন্তু জিপ্সী কেন? ইচ্ছা করলে শ্রমিক হতে পার।"

"শ্রমিক। উহুঁ।" বাদল মাথা নাড়ল। "শ্রমিকরা ঠাওরাবে তাদের রুটি কেড়ে নিচ্ছি।"

"জিপ্সীরাও তা ঠাওরাবে। যার রুটির দরকার সে যদি খেটে খায় তবে ত সে সত্যি কেড়ে নিচ্ছে না।"

"জিপ্সী হলে," বাদল পাশ কাটিয়ে বলল, "আহারনিদ্রার জন্য ভাবতে হয় না। শ্রমিকের সে ভাবনা আছে।"

"জিপ্সীদের সম্বন্ধে তোমার ও ধারণা রোমান্টিক।" মার্গারেট হাসল। "ভাবনা যেমন শ্রমিকের তেমনি জিপ্সীর।"

"কিন্তু আহারনিদ্রার জন্যেই যদি ভাবতে হল তবে অন্য ভাবনা ভাবব কখন? আমার যে একেবারেই সময় নেই বাজে ভাবনা ভাবতে। অথচ ওদিকে টাকার ঘরে শূন্য।" বাদল সব খুলে বলল।

মার্গারেট নিজের উদাহরণ দিয়ে বলল, "আমার আহারনিদ্রার দায় তাদের উপরে যাদের জন্যে আমি খাটি। তুমি যদি আত্মকেন্দ্রিক না হও তোমার আহারনিদ্রার ভার অন্য অনেকে নেবে। তারা হয়ত সম্পূর্ণ অচেনা লোক, প্রতিদিন নতুন।"

"তোমার কি তাই অভিজ্ঞতা?"

"হাঁ, বাদল। আমি নিজের জন্যে এক মিনিটও ভাবতে রাজি নই। আমার সমস্ত সময় যায় পরের জন্যে খাটতে। কেউ না কেউ খেতে বলে, খাই। শুতে দেয়, শুই। দেখলে ত আজ রুটি বের করছিলুম, কাল কয়লা বয়ে বেড়াব। যেদিন যেখানে ডাক পড়ে সেদিন সেখানে গিয়ে জুটি।"

"পরকেন্দ্রিক হতে আমার স্বভাবের বাধা।" বাদল বলল। "নইলে পরের জন্যে খাটতে কি আমার অনিচ্ছা?"

ওরা চলতে চলতে টেমস নদীর ধারে এসে পড়ল।

বাদল সহর্ষে বলে উঠল, "পেয়েছি। পেয়েছি।"

"পেয়েছ? কী পেয়েছ, শুনি!"

"রাত্রে নদীর ধারে শোব। একটা ভাবনা ত মিটল। বাকি থাকল আর একটা।"

মার্গারেট উৎসাহ দিল না। ওটা একটা য্যাডভেঞ্চার, বাদল। ওতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না।"

বাদল তর্ক করল। কত লোক নদীর ধারে শোয়। সে কি তাদের তুলনায় ভীতু? না তার শরীর অপটু?

"তা নয়। তোমার সমস্যা ত গোড়ায় এই যে তুমি জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাও?"

"আমার সমস্যার সমাধানের জন্য জনগণের সঙ্গে যেটুকু এক হওয়া একান্ত আবশ্যক সেটুকু এক হতে আমি উৎসুক ও ইচ্ছুক, তার অধিক নয়।"

"আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাদল।" মার্গারেট ব্যথিত হল। "অমন করে তুমি যুদ্ধের ফল পাবে না, বিপ্লবের ত নয়ই। মাঝখান থেকে জনগণের সঙ্গে এক হওয়ার যে বিশুদ্ধ আনন্দ তাও মিলবে না।"

বাদল স্বীকার করল না, তর্ক শুরু করল। মার্গারেট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যদি একটা অ্যাডভেঞ্চার চাও ত নিরাশ হবে না। নদীর বাঁধে রাত কাটানো তোমার জীবনে এই প্রথম হলেও অপরের জীবনে তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কোথায়? আর তোমার মনেও ত জনগণের প্রতি অহেতুক প্রীতি নেই, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে তোমার স্বভাবে বাধে।"

বাদল তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কত রকম যুক্তি আবিষ্কার করেছিল এই কয়েক মিনিটে। কিন্তু মার্গারেটের মুখ দেখে মনে হল সে কোনো যুক্তি শুনবে না। আসলে বাদল পরের বাড়ী শুতে প্রস্তুত নয়, কেউ শুতে ডাকলে সে শোবে না, তার লজ্জা করবে। তাই নদীর বাঁধ ছাড়া তার গতি নেই।

'অ্যাডভেঞ্চার বলে সব জিনিষ যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তবে করবার কিছু থাকে না।" বাদল অনুযোগ করল।

"সব জিনিষ নয়। যাতে পরের পরিতৃপ্তি তাতে নিজেকে নিয়োগ করলে দেখবে নিজেরও তৃপ্তি আছে। অ্যাডভেঞ্চারের তৃপ্তি কেবল নিজের।"

"মার্গারেট', বাদল প্রশ্ন করল, "তুমি কি কমিউনিজম ছেড়ে দিলে?"

"কে বলল? না", মার্গারেট প্রতিবাদ করল, "আমি আমার মতবাদে অটল আছি। জগতে যতকাল শোষণ থাকবে ততকাল কমিউনিজমের প্রয়োজন থাকবে, শোষণ নিবারণের অন্য কোনো পন্থা নেই। কিন্তু দিনরাত লোকদের উস্কানি দিয়ে বেড়ালে ফল হয় উল্টো, লোকের মন ক্রমে বিমুখ হয়, লোকে ভাবে এরা শুধু ঐ একটি বিদ্যা জানে।"

'এবার নির্ব্বাচনে কমিউনিস্টদের একজনও জিতল না তার কারণ বোধ হয়," বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, মার্গারেট কেড়ে নিয়ে বলল, "এই যে আমাদের উপর লোকের আস্থা জন্মায়নি। লেবার পার্টির কর্মীরা অনেক দিন ধরে অনেক কষ্ট সয়েছে, ত্যাগ করেছে, সাধারণের

সঙ্গে একাত্মা হয়েছে, সাধারণ তাদের চেনে ও বিশ্বাস করে। আমরাও যদি চরিত্রের দ্বারা হৃদয় জয় করি তবে মতবাদের দ্বারা রাজ্য জয় করব। চরিত্রকে উপহাস করে আমরা ভুল করেছি। আমরা ভুল ভেবেছি যে শক্তি আসে কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ সংগ্রাম থেকে।"

এসব শুনে বাদল বলল, "তোমার পার্টি কি তোমার সঙ্গে একমত?"

মার্গারেট সখেদে বলল, "না। বিশুদ্ধ রাজনীতি ওদের মাথা খেয়েছে। ওরা বোঝে না যে লেবার পার্টির জয়ের পিছনে বিশুদ্ধ রাজনীতি নয়, খানিকটে ধর্মনীতি রয়েছে। রাশিয়াতেও যারা কমিউনিজম পত্তন করেছিল তারা ধর্ম না মানলেও যা মানত তার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল, দিতে উদ্যত ছিল, ত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, ভোগে বিতৃষ্ণ ছিল।"

বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। মার্গারেটকে নাড়া দিয়ে বলল, "দেখছ ও কে? ওই তোমাদের কালের বাদল। আমি দেশলাই ফেরি করব।"

"আর একটা র‍্যাডভেঞ্চার" মার্গারেট যেন ঠাণ্ডা জল ঢালা।

"নদীর বাঁধে শোওয়া, দেশলাই বেচে খাওয়া, এই করলেই আমি শ্রেণীচ্যুত হব। তা হলে আমি টের পাব কোথায় জুতো চিমটি কাটছে। তারপরে আমি আবিষ্কার করব আমার কলকাঠি, যা দিয়ে ঘটাব রুধিরহীন বিপ্লব।"

* একটি উপন্যাসের অংশ।

হবিবর রহমান

আবুল কাসেম ফজলুল হক

'ফজলুল হক জিন্দাবাদ' 'শের বাঙলা জিন্দাবাদ'।

অকস্মাৎ বজ্রনাদে শীতের ভোররাত্রির আরামের ঘুম ভেঙে গেল। খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা বিরক্তিতে গাড়ীর জানলা খুলে মাথা বের করে দেখলুম—ষ্টেশনে লোকারণ্য। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন জনতার ঠেলাঠেলি, শতকণ্ঠে যুগপৎ পরস্পরবিরোধী নির্দ্দেশ ও হট্টগোল। জানতুম সেই গাড়ীতে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক চট্টগ্রাম যাচ্ছেন, কিন্তু চট্টগ্রামে পৌঁছনোর আগেই যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য ষ্টেশনে এত লোক সমাগম হবে, তা ভাবি নি। শীতের ভোরে লোকে এসেছে খালি পায়ে, গায়ে একখানি চাদর জড়ানো। ছেঁড়া ধুতি, ছেঁড়া লুঙ্গির ছড়াছড়ি। সামনে পাজামা-পরা আচকানে দেহ ঢাকা শ্মশ্রুল ও শ্মশ্রুহীন আত্মসচেতন কয়েকটি মূর্তি, হাতে ফুলের মালা। তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়, সফেদপোষেরা চিরদিনই সুবিধাবাদী। দুদিন আগেও যারা ফজলুল হকের নিপাত কামনা না করে জলগ্রহণ করে নি, আজ তার অভ্যর্থনায় তারাই অগ্রণী। মনে পড়ে গেল কলকাতার কথা। সরকারী চাকুরে, রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবেও যোগ দেবার তার কথা নয়, ছমাস আগেও মুসলিম সংহতিভঙ্গকারী কংগ্রেসী ফজলুল হকের প্রতি তার কি আক্রোশ। অথচ পটুয়াখালির নির্বাচনের ফল যেদিন বেরোল, ফজলুল হকের বাড়ী মালা নিয়ে সেই এসে প্রথম হাজির। তাই সাদাপোষেরা যে আজ এসেছে, তাতে বিচিত্র নেই, কিন্তু ধূলাকাদায় চলে যাদের পা হাজা, পরণে যাদের সম্বৎসর গামছা এবং পরবের দিন তালি দেওয়া লুঙ্গি, খেতে না পেয়ে যাদের পাঁজরের হাড়গুলি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ, তারা এ শীতের ভোরে এসেছে ষ্টেশনে কিসের টানে?

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল—একটু পরেই চাঁটগা পৌঁছবে। ষ্টেশনে গাড়ী আসবার আগেই দেখলাম লোকারণ্য—বুঝলাম যে গাঁয়ের ষ্টেশনে যা দেখছি, সহরে তারই সহরে সংস্করণ দেখতে হবে। ষ্টেশন থেকে এখন শীঘ্র বেরোনো যাবে না, তখন তামাসা ভাল করেই দেখা যাক। নামলেন ফজলুল হক গাড়ী থেকে। বিরাট বপু, দীর্ঘ দেহ এবং তারও চেয়ে লক্ষ্যণীয় প্রশস্ত স্কন্ধ। বোধ হল বুকের ছাতিই প্রথম চোখে পড়ে—মনে হয় জনতার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতন কুস্তিগীরের চেহারা। মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হতে হল—কুৎসিত বলে নয়, কারণ কুৎসিত চেহারা তো অনেক রাষ্ট্রনেতারই রাজনৈতিক পুঁজি। অকস্মাৎ লিংকন বা গান্ধীর কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু তাঁদের মুখে তো ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-বিশ্বাসের ছবি দীপ্যমান। ফজলুল হকের পৌরুষ ফুটে উঠে তাঁর দেহে, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে, কিন্তু যে অনাসক্ত প্রতিভা সমস্ত বাধাবিপদ লঙ্ঘন করে বিরুদ্ধবাদী জনতার নিরাবয়ব অঙ্গে নিজস্ব রূপ ও ভঙ্গির ছাপ মেরে দেয়, ফজলুল হকের ললাটে ও চক্ষে তার দীপ্তি কই? ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, চোখগুলিতে শক্তির চেয়ে হাস্তরসের ইঙ্গিত বেশী, চিবুকে অনমনীয় দৃঢ়তার চেয়ে আবেগের ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর—এ কি রাষ্ট্রনায়ক জননেতা, না গণপ্রতিনিধি জনতার প্রতীক? হয়তো বা ক্রীড়নক?

ফজলুল হকের শক্তি এবং দুর্বলতা দুইয়েরই কেন্দ্র জনতার সঙ্গে তাঁর যোগে। জনতার নিজস্ব কোন চিরস্থায়ী রূপ নাই, আবেগের আলোড়নে মুহূর্তে মুহূর্তে তার চেহারা বদলায়। কখন কোথায় থেকে বইবে আশা ও আশঙ্কার হাওয়া, কোথায় থেকে উঠবে ঝড়, কে জানে? জলের যেমন নিজস্ব রূপ নেই, আধারের রূপেই তার রূপ, জনতারও তাই। ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে তার পরিবর্তন বিস্ময়কর বটে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। জনতার প্রতীক ফজলুল হকের রূপান্তরগুলিও তাই বিস্ময়কর কিন্তু জনতার মনোবৃত্তির যারা খবর রাখে, তাদের কাছে প্রত্যাশিত, এমন কি খানিকটা স্বাভাবিক বটে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক

ফজলুল হকের বুদ্ধি ও প্রতিভা অনস্বীকার্য, এমন কি তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করে যে বর্তমানে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ও দূরদৃষ্টিতে বাঙালাদেশে তো তাঁর তুলনা কেউ-ই নেই, সমগ্র ভারতবর্ষেও তাঁর জুড়ি দু'চার জনের বেশী মিলবে না। তবু অস্থির-মতির অপবাদ তাঁর অঙ্গের ভূষণ। প্রথম দৃষ্টিতেও এ অসঙ্গতি বিসদৃশ যার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, তার কি এতটুকু বিচার নেই যে অস্থির-মতির অপবাদে তার কতখানি ক্ষতি হতে পারে? বুদ্ধির সঙ্গে চরিত্রের যোগও গভীর ও গূঢ়, তাই লঘুচরিত্র কেবলমাত্র চরিত্রের দোষ নয়, তাকে বুদ্ধির দোষ বলেও গণনা করতে হবে।

ব্যক্তির পক্ষে একথা সত্য, কিন্তু গণের বেলা এ কড়াকড়ি বাধন বোধ হয় চলে না। জনতার চরিত্র নাই, তাই চরিত্রের দোষও নাই। জনতার বুদ্ধি নাই, তাই জনতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা বুদ্ধির অভাব কোন অভিযোগই চলে না। জনতার থাকে আবেগ, বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ভঙ্গী। সেজন্যই সাধারণের কোন স্মৃতি নাই, আজ যাকে মাথায় করে নাচে, তারই গায় ছুরী দিতে কাল এক মুহূর্তও বিলম্ব সয় না। জনতা তাই সৎও নয়, অসৎও নয়—তার রয়েছে কেবলমাত্র সত্তা। জনতার প্রতীক ফজলুল হক সম্বন্ধেও বোধহয় সে কথা খাটে, এবং সেজন্য সাধারণ নীতিবিচারের মানদণ্ডে তাঁর পরিমাপ ব্যর্থ পরিহাসে দাঁড়ায়।

এই নৈর্ব্যক্তিকতাই ফজলুল হকের শক্তির উৎস। জনতার সঙ্গে একাত্ম-বোধের ফলে তাঁর নিজস্ব আবেগ ও বিচার জনধর্মী হয়ে পড়েছে, ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকে বুঝতে গেলে পদে পদে ঠকতে হয়। উপস্থিত পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর পরিবর্তন অনেককে বিস্মিত করেছে। লক্ষ্ণৌয়ে মোসলেম লীগ অধিবেশনে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের ভীত, সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত মোসলেম জনতার স্নায়ুচাঞ্চল্য ও আত্মরক্ষা-মনোবৃত্তি তাঁর বক্তৃতার যেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, সে প্রদেশের কোন নেতার বক্তৃতায় কি তার তুলনা মেলে? আবার বাঙলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকের সমাবেশে তাদের অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা তার মনে যে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে, সে ধ্বনি তাদের যে ভাবে মুগ্ধ করেছে তারও কি তুলনা আছে? বহুরূপীর কথা শোনা যায় যে প্রতিবেশের রং বদলের

সঙ্গে তাবও বঙ বদলায। ফজলুল হকেবও কি সেই বঙ বদলাবাব ক্ষমতা তাঁব বাজনৈতিক সাফল্যেব মূলে? নিপুণ অভিনেতাব যেমন দর্শকবৃন্দেব সঙ্গে অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা, জনতাব সঙ্গে ফজলুল হকেবও সেই নিবিড় যোগবন্ধন। তাই ফজলুল হকেব মুখে যে বাণী, সে বাণী তাঁব নিজস্ব ব্যক্তিগত কথা নয় প্রতিবেশেব পুঞ্জীভূত আবেগ ও আশা আকাঙ্ক্ষাব তিনি মুখপাত্র মাত্র। প্রতিবেশকে প্রতিফলিত কববাব অসাধাবণ শক্তিই তাঁব প্রতিভাব মূলসূত্র।

বহস্যবোধ চিবদিনই নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত আবেগ যেখানে ঘনিষ্ঠ, সেখানে ব্যঙ্গ কৌতুকেব স্থান নাই। নৈর্ব্যক্তিকতাই তাই বহস্যবোধেবও প্রাণ। সাধাবণেব আবেগেব লীলাব মধ্যে ব্যক্তিব বৈশিষ্ট্য লীন হয যায়—তাই সাধাবণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিকে বিচাব কবলে কৌতুক ঝলকে উঠে। যাদেব নিয়ে আমবা হাসি, তাদেব ব্যক্তিজীবনেব দৃষ্টিতে সেগুলি হাসিব মসলা নয, ববং কান্নাবই উপকবণ। ব্যক্তিহিসাবে তাদেব ভুলতে পাবি বলেই তাদেব অসঙ্গতি, ত্রুটী এবং দোষ আমাদেব হাসিব উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায। যে নৈর্ব্যক্তিক, সে তাই সর্বত্রই হাসিব মসলা খুঁজে পায়, এমন কি নিজেব চবিত্রেব অসঙ্গতি, দোষ ও ত্রুটীগুলিও তাব চোখে হাস্যকব। নিজেকে নিয়ে যে যত হাসতে পাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব সংকীর্ণতা হতে সে সেই পবিমাণে মুক্ত।

ফজলুল হক যে জনতাব প্রতিনিধি, এবং প্রভাব হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক, তাব বহস্যবোধ এ কথাব অন্যতম প্রমাণ। বাজনীতিতে এতখানি কৌতুক-সৃষ্টি বেশী নেতা কবেন নি। আবাব সে কৌতুক উপভোগও বোধ হয আব কেউ এতখানি কবে নি। নিজেকে নিযেও হাসবাব এ শক্তি তাঁব জনপ্রিযতাবও অন্যতম কাবণ। শোনা যায যে তাঁব চাকুবী জীবনে একবাব এক ইংবেজ ম্যাজিস্ট্রেট ফজলুল হককে চিঠি লেখে যে জনৈক আসামীকে সাজা দিতে হবে। ডিপুটী ফজলুল হকেব এজলাসে বিচাব— তিনি বাযে লিখলেন যে আসামীব বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ, তাতে তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত, কিন্তু আমার উপবিওযালা কর্মচাবীব অনুবোধ যে তাকে

শাস্তি দিতে হবে। চাকরীর কায়দা অনুসারে উপরিওয়ালার অনুরোধ হুকুমের সামিল, অতএব আমি আসামীকে সাজা দিলাম এবং আমার এ আদেশের হেতুস্বরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠিখানি নথিবদ্ধ করবার আদেশ দিচ্ছি।

অল্প দিন হ'ল জিন্নাসাহেবের সঙ্গে মতান্তরের পর যে মনান্তর ঘটেছে, সে প্রসঙ্গে বড়দিনের উপহার হিসাবে জিন্নাসাহেবকে বড়লাটের হাতে সমর্পণের কথা আজো হয়তো অনেকের স্মরণ আছে। সম্প্রতি ক্রীপস সাহেবের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে তার কৌতুকবোধের যে প্রমাণ মিলেছে, তাও যেমন উপভোগ্য তেমনি রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মন্তব্য আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং ভারতের মনোভাব এত স্পষ্টভাবে বোধ হয় আর কিছুতেই প্রকাশ পায় নি। ফজলুল হকের প্রতিক্রিয়ার ঝলসে উঠেছে ভারতের সাধারণ লোকের ব্যঙ্গ বোধ—যে ব্যঙ্গ ইংরেজের সমস্ত ভণ্ডামি ও আত্মম্ভরিতাকে হাসির আঘাতে দীর্ণ করে দেয়। ক্রীপস সাহেব তো অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্রিটিশ সমরপরিষদের প্রস্তাব নিয়ে এদেশে এলেন। কেউ জানে না প্রস্তাবে কি আছে কিন্তু দুনিয়াময় ইংরেজ এবং তাদের ভাড়াটিয়ারা রটিয়ে দিল যে এবার আর গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার কিছুই বাকী থাকবে না। ভারতীয় নেতারা একে একে সংগোপনে কিছু না বলবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করে এলেন—বাইরে এঁরা সবাই প্রতিমূর্তির মত চুপচাপ—যা কিছু আলোড়ন এবং উত্তেজনা একমাত্র সাংবাদিক মহলে। হক সাহেবও নিমন্ত্রিতদের অন্যতম—ক্রীপস প্রস্তাব শুনে অন্যদের মত তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল না, বিপুল অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। সে হাসি এত প্রবল এবং বন্ধনহীন যে ক্রীপসের মতন পাকা কূটনীতি ব্যবসায়ীও একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। লোকটা এত হাসে কেন? তাকে পাগল ভাবাও কঠিন, তবে কি ইংরেজ এবং তাঁর প্রস্তাবের উদারতার বহর দেখেই এত হাসি?

হাসিতে দম ফেটে যায়, তবু কষ্টে একটু আত্মস্থ হয়ে ক্রীপসকে হক সাহেব বললেন, তোমাদের এ প্রস্তাব সত্যিই একান্ত উপভোগ্য—আমার ছেলেবেলার গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিদ্যার জাহাজ কিন্তু টাকা পয়সার বেলা একেবারে ফাঁকা। একদিন ব্রাহ্মণী

চটেমটে বলল, তোমার বিদ্যা ধুয়ে তো খাওয়া চলবে না, হয় টাকা রোজগার কর, নইলে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ব্রাহ্মণ বলল— এই কথা, আচ্ছা, দিন পনেরো সময় দাও, তোমাকে থলি ভরে টাকা এনে দেব। বাড়ী ছেড়ে ব্রাহ্মণ এক বড় সহরে এ'ল—ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল, আমার কাছে এক মরার খুলি আছে, ভূত ভবিষ্যতের যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তারই উত্তর মিলবে। খরচা প্রশ্ন প্রতি এক টাকা। ব্রাহ্মণের বিদ্যার খ্যাতি ছিল, এ খবরে সহর ভেঙে লোক ভবিষ্যৎ জানতে এল। এক এক করে ব্রাহ্মণ তাদের অন্ধকার এক ঘরে নিয়ে যায়— কালো বনাত দিয়ে ঘেরা, সবাই অনেক আশা অনেক আগ্রহ নিয়ে আসে, ভেতরে গিয়ে দেখে একটা মরা লোক। কোথায় মড়ার খুলি, কোথায় প্রশ্নের উত্তর? ব্রাহ্মণ এসে বলে—ভাই, তোমাকে তো ঠকিয়েছি, এখন আমাকে ধরে মার দিলেও তোমার ঠকা কমবে না, বরং লোকে হাসবে। তার চেয়ে কিছু না বলে চুপচাপ চলে যাও, মনে কর যে গরীব এক ব্রাহ্মণকে একটা টাকা দান করে দিলে। সবাই ভাববে যে তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ, আরো লোক আসবে, সকলে ঠকলে আর কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন দুঃখ বা লজ্জা থাকবে না।

ক্রীপস্‌কে হক সাহেব বললেন যে, তোমাকে দেখে আজ আমার সেই বামুন পণ্ডিতের কথা মনে পড়ছে। এলে ঢাকঢোল বাজিয়ে, ভারতবন্ধু বলে তোমার খ্যাতিও ছিল, কিন্তু এসে দেখি যে সবশুদ্ধ মরার খুলির বদলে এনেছ এক মরা কাকের শব।

নৈর্ব্যক্তিকতা এবং রহস্যবোধ, এ দুটোর সমন্বয় ফজলুল হক জনতার প্রতিনিধি, এবং জনতার প্রতীক বলেই আজো জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি 'ফজলুল হক জিন্দাবাদ', 'শেরে বাঙলা জিন্দাবাদ।'

অরুণ মিত্র

রূপান্তর

সিঁদুর মেঘের রাঙা ক্ষীণ সিঁথি ক্ষতরেখা।
রক্তঝরা বেলা।
জটায়ু-পাখার শব্দ প্রান্তরের তৃণে কাঁপে,
মুগ্ধ চোখ মেলা
জঙ্গলের জটলায়। সহিষ্ণু প্রহর
ক্ষ'য়ে যায়, ক্ষ'য়ে যায় মর্মরের ঘর।
প্রাণান্ত প্রণয় শুধু নিশীথ আভাসে হবে
হয়তো বর্বর।
চূর্ণ কুন্তলের জালে ললাটিকা উল্কামুখী।
দক্ষিণ বাতাসে
আগুনের আঁচ লাগে। গম্ভীর গানের রেশে
ক্লান্ত স্মৃতি ভাসে।
দিয়েছ বিদায় সদ্য গোধূলি-ধবল
শুকতারা— সন্ধ্যামণি তারা সুকোমল।
অগ্নিবাষ্পে নবস্বাদ ওষ্ঠাধরে, স্বেদমুক্তা
দীপ্ত করতল।
পুষ্পতনু টানিয়াছি। দেখ না কি মাঝখানে
অসিধার সীমা?
টঙ্কারে বেজেছে যত গত দিন মুহুর্মুহু,
তাদের মহিমা
মিশায় যে চক্রবালে—আবেগ আকাশ
স্পন্দমান। শূন্যপত্র শাখার বিন্যাস
বায়ুস্তরে, লাল ফুল স্তবকে স্তবকে খালি
এনেছে উচ্ছ্বাস।

সমর সেন

জানুয়ারী, ১৯৪২

(১)

সত্তার কৌলীন্য খোয়াবো না কোনো দিন
এ গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা।
বিশ্বকে বিচলিত করার সাহস রাখে না,
চিন্তিত দর্শক, হয়ত বোঝে
দুনিয়াদারীর দুর্দিন, বাজার অন্ধকার,
পথে জমকালো স্তব্ধতা,
বেগতিক দেখে মহাত্মাদের প্রস্থান
নিশাচরের নাচ নির্জন ঘাটে।

(২)

ঘরে ফিরি আলো জেলে কুলুঙ্গীতে রাখি,
এ অন্দরে আরো অনেক অন্ধকার জমে।
চলিত সভ্যতার মোড়ে বিপরীত মতামতে ধাঁধা লাগে,
কোন ঘাটে তরী ভিড়াই?
নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর মসৃণ অন্ধকার,
দেহ স্বার্থের স্বর্গে আস্থা নেই,
ও নিরুদ্বেগ উদ্দাম বিলাস
নতুন মানুষের জন্যে
আবার জন্মমৃত্যু প্রেমের কারাগার নাচে
বিষে বিষ অক্ষয় ক্ষয়।
স্বার্থপর ও অর্থহীন শরীরের কারবার
যদি না গড়ি নতুন বিশ্বসংসার।

জানুয়ারী, ১৯৪২

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি,
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে,
খালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে

সকালসন্ধ্যা গড়াগড়ি দিই গাছতলাতে
পাথর এ প্রাণ তবুও গলেনা বৃষ্টি, তাতে।
গৃহে গঞ্জনা, প্রকৃতিকে ভালোবাসছি তাই—
ভাবালু বাতাস আদৌ সয়না সহুরে ধাতে,
কাজ মেলেনিকো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,
আসে বসন্ত, অন্তরে দাবদাহের ছাই।

যেখানে ধাঁধার মত অলিগলি টানে জনতা,
কর্মখালির আশাতে হাটুর কাটে জড়তা,
যেখানে মিলের গাঁথুনি আকাশে হাত বাড়ায়—
সেখানে ঘুরালো গরীব গ্রাম্যজনের কথা।
অশরীরী সাধ ভূতপূর্বই আজো বেড়ায়,
ঢিমে এ জীবন তড়িৎগতির চমক চায়।

জমিজমা গেছে, শেষে বন্ধক থালাবাসন,
উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন।
বাল্যবন্ধু ছিল বাবা, গেছে নিরুদ্দেশে—
অখ্যাত ধুল রাস্তা ঢেকেছে, ঝরে শ্রাবণ।
স্মৃতির জাবর কাটিতে একলা আমি এদেশে,
পালাবার পথ বন্ধ, প্লাবনে যাচ্ছি ভেসে

দিনেশ দাস

ব্যাঙ্ক

সারাদিন পরে স্বর্ণ-সিংহ লৌহগুহায় ঢোকে
ক্লান্ত লেজার আসিছে বন্ধ হ'য়ে,
বাইরে এখন বৈকালী ঝড়ে অজস্র সোনা ওড়ে
সোনালী বিকেল স্বর্ণের সমারোহে।

আমাদের আর বাহির-পৃথিবী হানে নাকো ইঙ্গিত—
বেনে-পৃথিবীর আমরা পাহারাদার,
প্রতি দিনকার সুখ গড়ায় তপ্ত চায়ের কাপে
হাফ কাপ্ চায়ে দিন হয় গুলজার।

এই বৈকালে গঙ্গার কোলে স্বর্ণমৃগেরা চরে—
সোনার হরিণ সুবর্ণ ঝর্ণার,
বৈশ্য-যুগের নিকটে ওরা তো নিছক অবাস্তব
অবহেলিত সে স্বর্ণাভ স্রোত সীসা হয় বেদনার।

কাউণ্টারের কেরাণীর আজ অবাধ্য অন্তর
ভাবি কতদিন বেনে-পৃথিবীর উদ্ধত পোদ্দারী,
জীবন্ত সোনা ডুবিছে এখন বড় গঙ্গার জলে
আর কতকাল মৃত-স্বর্ণের এমনি পাহারাদারী।

নবগোপাল দাস

এপিঠ ওপিঠ

বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়াই সুলতা সুকুমারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

অথচ প্রথম যখন তাহাদের পরিচয় হয় তখন সুলতা ভাবিতেই পারে নাই সুকুমারের সাহচর্য তাহার কাছে এতখানি কম লোভনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

সে আকৃষ্ট হইয়াছিল সুকুমারের বুদ্ধিমত্তায়, তাহার চমকপ্রদ পাণ্ডিত্যে। সুলতা নিজেও ছিল ধীমতী, সুকুমারের মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল উপলব্ধিপ্রবণ একটি মন। বিবাহের কথা সুলতা গম্ভীরভাবে ভাবিয়া দেখে নাই, তবে তাহার অনুভূতি ভালবাসার পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে দেরী হইত না যদি সুকুমারের কতকগুলি ব্যবহারে তাহার মনের সবকয়টি তন্ত্রী একসঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া না যাইত।

গম্ভীর, ধীমান্ সুকুমার প্রথম ভুল করিয়া বসিল তাহার প্রেমনিবেদনে। সে জানিত না সুলতার প্রধান বশ্যতা ছিল ঐ বিষয়ে। তাহার আদর্শ-বিলাসী মন গতানুগতিক প্রেমনিবেদন মোটেই সহ্য করিতে পারিত না।

কলেজে প্রশংসা উপযাচিকাদের দলে সে কখনও ছিল না। তাহাদের গণ্ডী সে বিশেষভাবে এড়াইয়া চলিত এবং এজন্য মাঝে মাঝে অপ্রিয় উপহাসসূচক দুই-একটি কথাও তাহার শুনিতে হইয়াছে। সুকুমারের দুর্ভাগ্য সে সুলতার সঙ্গে কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে নাই। যদি পড়িত তবে হয়ত সে এই ভুল করিয়া বসিত না।

তাই মাসখানেক মেলামেশার পর সুকুমার যখন উচ্ছ্বাসপূর্ণ এক চিঠিতে সুলতার কাছে তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিল তখন সুলতা যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত চমকাইয়া উঠিল।

আবেগময়ী ভাষায় সুদীর্ঘ আটপৃষ্ঠার চিঠিতে সুকুমার যাহা বলিতে চাহিয়াছিল তাহার সারমর্ম এই যে সুলতা তাহার জীবনের ধ্রুবতারাস্বরূপিণী,

"ত্রিকাল" বিজ্ঞাপনী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প এবং প্রবন্ধ, এই চারিটি ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে প্রতি খণ্ড সমৃদ্ধ। এ-পর্যন্ত প্রচলিত রচনার সংগ্রহ নয় খণ্ড ও অপ্রচলিত রচনার সংগ্রহ দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আনুমানিক পঁচিশ খণ্ডে সমগ্র রচনাবলী সমাপ্ত হইবে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য

কাগজের মলাট	৪৷৷০
রেক্সিনে বাঁধাই	৫৸০
রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা	৬৸০
বিশিষ্ট সংস্করণ, চামড়ার বাঁধাই	৮৷৷০

গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হইলে জানানো হয়, বা ভি পি-তে পাঠানো হয়।

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যে-সকল রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, যে-সকল রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ও কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) প্রথম প্রকাশিত হয় কিন্তু পরে আর কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, যে-সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং যে-সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে,—সবই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

আকাশে-বাতাসে প্রত্যুষ-সন্ধ্যায় সে শুধু দেখিতে পায় সুলতার ছবি আর শুনিতে পায় তাহার কণ্ঠস্বর এবং সুলতাকে না পাইলে তাহার জীবন একেবারে বিফল হইয়া যাইবে। কথাগুলি হয়ত খুবই সত্য এবং অতিরঞ্জন-দোষে মোটেই দুষ্ট নয়, কিন্তু সাম্যমৈত্রীবিলাসী সুলতা সুকুমারের এই চিঠির মধ্যে দেখিতে পাইল নারীসুলভ একটা ভীরুতা, অত্যন্ত দুর্বল এবং কাতর একটা অনুনয়। মুহূর্তের মধ্যে তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিল।

সে ভাবিল, সুকুমার কেন তাহাকে সোজাসুজি বলিল না যে সে তাহাকে ভালবাসে? কেন সে নিজে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল না সুলতা তাহাকে গ্রহণ করিবে কি না? মুখে প্রত্যাখ্যাত হইবার ভয় বীমান্ লোকদেরও কি এতখানি পাইয়া বসে যে চিঠির আড়ালে আশ্রয় নেওয়াটাই তাহারা বেশী পুরুষোচিত মনে করে?

সুলতা সুকুমারের চিঠির কোন জবাব দিল না।

সুকুমার কয়েকদিন অপেক্ষা করিল। ভাবিল, সুলতা হয়ত নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতেছে, সব কিছু ভাবিয়া-চিন্তিয়া জবাব দিবে। সুকুমার অধীর এই অপবাদ তাহার অতিবড় শত্রুও দিতে পারিবে না।

কিন্তু আর একটা ভুল সুকুমার করিয়া বসিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার সমস্ত অবসরটা সে সুলতাকে এড়াইয়া চলিল। ফল হইল এই যে তাহার প্রাত্যহিক আনাগোনার ব্যতিক্রম সুলতার চোখের সম্মুখে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। সুলতা দেখিল সুকুমার শুধু ভীরু নহে, তাহার ব্যবহারের মধ্যে সহজ সরলতার অভাবও আছে। আত্মসম্মান-বোধসম্পন্না সুলতাও গায়ে পড়িয়া সুকুমারের কোন খোঁজ করিল না।

সপ্তাহ দুই অপেক্ষা করিয়া সুকুমার সুলতার কাছে আবার চিঠি লিখিল, কুণ্ঠিত সঙ্কোচের সহিত, দীন ভিক্ষুকের মত। বলিল, সুলতার নীরবতা তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, সে শুধু জানিতে চাহে তাহার ভালবাসার প্রতিদান পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। সুলতার যদি এতটুকুও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকিয়া থাকে সে যেন দয়া করিয়া তাহাকে জানায়। সুকুমার চিরদিন সুলতাকে ভালবাসিবে, কিন্তু তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবে না।

চিঠিটা পড়িয়া সুলতা তাহা নূতন একটা খামে পুরিয়া উপরে শুধু সুকুমারের ঠিকানাটা লিখিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিল।

সুকুমার বুঝিল তাহার মানসী তাহার উপচার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। প্রতিশ্রুতিমত সে সুলতার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যত্র পলাইল।

ইহার পর বৎসরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। সুকুমারের স্মৃতি সুলতার মন হইতে প্রায় মুছিয়া আসিয়াছে। সুকুমারের নীরবে দূরে সরিয়া যাওয়ায় সে হয়ত একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ক্ষোভকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল একটা আত্মপ্রসাদ, যুদ্ধে প্রায় সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করিলে যেপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়। কোন দুর্বল মুহূর্ত্তে যে সে সুকুমারের নিবেদন গ্রহণ করিয়া বসে নাই ইহা ভাবিয়া সে নিজেকে বরং অভিনন্দিত করিতেই সুরু করিয়াছিল।

মনের এই প্রাণবন্ত অবস্থায় সে পরিচিত হইল নিরঞ্জনের সহিত।

নিরঞ্জন সুকুমার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সুকুমার ছিল, যাহাকে এককথায় বলা চলে, প্রধানতঃ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাহার এই বুদ্ধিসম্পন্নতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল ভাবপ্রবণতার একটা ছন্দ। নিরঞ্জন ছিল প্রধানতঃ বলিষ্ঠ, তাহার মুখের বুদ্ধিমত্তার ছায়ার চেয়েও প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়িত তাহার সুগঠিত মাংসপেশীগুলি। মেয়ে জাতটার সঙ্গে দর্শনবিজ্ঞান আলোচনা করাটা সে রীতিমত বাতুলতা মনে করিত।

যাহারা নিরঞ্জনকে ভালভাবে জানিত তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই সুলতার সঙ্গে নিরঞ্জনের বন্ধুত্ব কেমন করিয়া জমিয়া উঠিতে পারে। নিরঞ্জনের উদ্ধত ব্যবহার, মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার একটা প্রচ্ছন্ন অনুকম্পার ভাব সুলতাকে প্রতিহতই করিয়াছিল, কিন্তু সুলতাকে নিরঞ্জনের ভাল লাগিয়াছিল এবং সে তাহার বন্ধু হইবার জন্য একটু অস্বাভাবিক ভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

নিরঞ্জনের এই গায়ে পড়িয়া বন্ধুত্ব পাতানো সুলতা পছন্দ করে নাই। কিন্তু নিরঞ্জনের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা বেপরোয়া ভাব, এমন একটা দম্ভ ছিল যে শত চেষ্টা করিয়াও সুলতা তাহাকে খোলাখুলি ভাবে বলিতে

পারে নাই যে নিরঞ্জনকে তাহার ভাল লাগে না। ফল হইল এই যে নিরঞ্জনের সঙ্গে সুলতার দেখাশোনা এবং আলাপপরিচয় অব্যাহত গতিতে বাড়িয়া চলিল।

শীঘ্রই সুলতা বুঝিতে পারিল নিরঞ্জন তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন নিরঞ্জন তাহার পাণিপ্রার্থনা করিয়া বসিবে এই সম্ভাবনায় তাহার মন মাঝে মাঝে শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতেও সুরু করিয়াছিল।

কিন্তু নিরঞ্জন যে এত সহসা এবং কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই প্রেমনিবেদন করিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

একদিন অন্যান্য কথার মধ্যে নিরঞ্জন যখন বলিয়া বসিল, সুলতা, অনিশ্চিত ভাবে আমাদের এই বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনই মানে হয় না—নরনারীর সহজ সম্বন্ধ বিবাহে এর পরিণতি ঘটাটাই সব চেয়ে সুষ্ঠু এবং সুরুচিসঙ্গত হবে, তখন সুলতা সত্যই চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

সুলতার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিরঞ্জন বলিয়া চলিল, তুমি হয়ত বলবে, এখখুনি এর জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয়, জীবনের এতবড় একটা ব্যাপার কি একমুহূর্তে স্থির করা চলে ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু আমি বলব, বেশী ভাবলে তোমার চিন্তাশক্তি আরও এলোমেলো হয়ে উঠবে, তুমি কিছুতেই একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবেনা।

অত্যন্ত দুর্বল ভাবে সুলতা বলিল, তাহ'লে কি আমাকে এখখুনি একটা জবাব দিতে হবে ?

একটু হাসিয়া নিরঞ্জন জবাব দিল, না, আমি ততটা জুলুম করতে চাইনা, তবে আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে ভাববার বিশেষ কিছু নেই। জবাব হতে পারে দুটো, "হ্যা" এবং "না", অতি সংক্ষিপ্ত দুটি কথা। যেটা বলতে চাও, ভয় পেয়োনা, আমি ভেঙ্গে পড়ব না। শুধু আমার অনুরোধ, অপ্রাসঙ্গিক এবং উপস্থিত প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অবান্তর যা' তা' কথা টেনে জবাব দেওয়াটাকে একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার ক'রে তুলোনা।

সুলতা ম্লান ভাবে বলিল, না, তা' করবনা।

তাহ'লে কাল যখন দেখা হ'বে আমাকে বলো, কেমন? বলিয়া নিরঞ্জন অন্যান্য কথাবার্তার পর সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সুলতা কখনও এই প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয় নাই।

সুকুমার যখন সুদীর্ঘ ভাবালু চিঠিতে তাহার প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিল তখন মনস্থির করিয়া উঠিতে সুলতার এতটুকুও বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু নিরঞ্জন?—সুলতা নিরঞ্জনের দাবীকে অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া নিতে মোটেই প্রস্তুত নহে, অথচ আত্মবিশ্লেষণ করিয়া সে সভয়ে লক্ষ্য করিল নিরঞ্জনকে প্রত্যাখ্যান করিতে যতখানি সাহস তাহার থাকা উচিত তাহা সে কিছুতেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

অথচ সুকুমার কী অপরাধ করিয়াছিল? তাহার ভীরুতা, তাহার সঙ্কোচের মধ্যে কি নিবিড় একটা শ্রদ্ধা নিহিত ছিল না? নিরঞ্জনের সরমকুণ্ঠাবিহীন দাবী কি প্রায় ধৃষ্টতার সীমা বেখায় আসিয়া পৌঁছায় নাই? কেন সে নিরঞ্জনকে গ্রহণ করিবে? নিরঞ্জন তাহাকে এমন কী দিয়াছে যা দিবে যাহা সে সুকুমারের নিকট হইতে পায় নাই বা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না?

সারা রাত সুলতা ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বেলা আন্দাজ আটটা হইবে—প্রশ্নবিক্ষত মনটাকে একটু সংযত করিয়া সুলতা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় চাকর একটা চিঠি আনিয়া তাহার হাতে দিল।

আবার চিঠি? মুহূর্ত্তের জন্য সুলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

কম্পিত হস্তে খুলিয়া দেখিল, নিরঞ্জন লিখিয়াছে—অতি সংক্ষেপে।

'সুলতা, আশা করি তুমি ভেবে দেখছ এবং তোমার উত্তর সম্মতিসূচকই হবে। একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি', আজ আমার জন্মদিন, আজকের দিনে আমাদের এই এনগেজমেন্টটা আরও বেশী আনন্দবর্দ্ধন করবে। আমি তোমাকে নিতে আসব—আজ দুপুরবেলা সহরের বাইরে কোথাও গিয়ে এই দিনটিকে আমরা স্মরণীয় ক'রে রাখব, কেমন?
—তোমার নিরঞ্জন।"

সুলতা খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে খোলা চিঠির দিকে তাকাইয়া রহিল। শুকনো পাতার সংজ্ঞাবিহীন অস্পষ্ট গন্ধের মত তাহার নাকের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল সুকুমারের কল্পনাবহুল চিঠিটার স্মৃতি।

না, নিরঞ্জনকে প্রত্যাখ্যান করা তাহার চলিবে না। আর সে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলেও নিরঞ্জন কিছুতেই তাহাকে সেই সুযোগ দিবে না।

নিজেরই অজ্ঞাতে সুলতার চোখ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ম্যাক্স ইস্ট্‌ম্যান

লিয়ঁ ট্রটস্কি

গত পনর বছর ধরে ট্রটস্কি ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে বীরের মত দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয়েছিল, সম্মানের উচ্চ আসন থেকে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল আর নির্বাসনের নির্মম শাস্তি তাঁর উপর জোর করে চাপান হয়েছিল। যারা তাঁকে বুঝেছিল, তারা করেছিল শঠতা, যারা তাঁকে বোঝেনি তারা করেছিল তাঁকে হত্যা করবার বার বার প্রয়াস। রক্ত-পিপাসু শত্রু, তাঁর বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি তাঁর সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করতে ছাড়েনি। নিজেকেও অবর্ণনীয় ক্লেশভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাঁর মানব শক্তি বা সাম্য হারিয়ে ফেলেন নি—মুহূর্তের জন্যও তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ছেদ পড়েনি। যে দুঃখকষ্ট অন্য যে কোন প্রতিভাশালী লেখককে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত করে তুলতো, সেই দুঃখকষ্টের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল ট্রটস্কির সাহিত্যিক স্বরূপ, তাঁর প্রতিভা হয়ে উঠেছিল পূর্ণবিকশিত। অর্ধসমাপ্ত "লেনিনের জীবনী" তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'তে পারতো। সমস্ত জগৎ যখন লক্ষ্যহীনের মতো দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছিল, তখন মানব-চক্ষুর সামনে ট্রটস্কি ধরেছিলেন নতুন যুগের নতুন পৃথিবীর ছবি।

স্পার্টাকাস, গ্রাচী, রোবস্‌পিয়ারী, মোরাট—এদের নামের সঙ্গে ট্রটস্কির নাম চিরকাল যুক্ত হয়ে থাকবে আদর্শ বৈপ্লবিক হিসাবে, বিপ্লব-বাহিনীর শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে। কিন্তু যতদিন ইতিহাস লেখা হবে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে অনেক প্রশ্নই উঠবে। তাঁর যে সব বন্ধু তাঁর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন, যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই। সত্য কথা বলবার

মতো কোন লোককেই তাঁর প্রতিপক্ষ জীবিত রাখেন নি। অনেকে হয়ত আমার ও ট্রট্স্কির সাহিত্যিক যোগসূত্রতার উল্লেখ করে মনে করতে পারেন, ট্রট্স্কি সম্বন্ধে সকল কিছুই আমি জানি, কিন্তু তা নয়। তাহলেও, যেটুকু আমি জানি, সেইটুকুই প্রকাশ করবার পক্ষে উপযুক্ত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১৯০৫ সালে রুশীয় জনসাধারণ সর্বপ্রথম যখন জারের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ট্রট্স্কি তখন তার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছিলেন। বারো বছর পরে, ১৯১৭ সালে, তিনি অক্টোবর-বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়লাভও করেন। তারপর, কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্ষুধিত, অর্ধনগ্ন জনসাধারণের মধ্য হ'তে তিনি যে অপূর্ব বৈপ্লবিক-বাহিনী গঠন করলেন, তা ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সাতটি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল।' সোভিয়েট রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে লেনিনের পরই ট্রট্স্কির স্থান। তারপর, বৈপ্লবিক রাষ্ট্র স্থাপিত হ'লে ট্রট্স্কি তিন খণ্ডে বিপ্লবের যে বিরাট ইতিহাস রচনা করলেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তা' অমরত্বের দাবী করতে পারে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও জীবনের শেষদিনগুলো তাঁকে কাটাতে হয়েছিল নির্জন নির্বাসনে—সেখানে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার লেশমাত্র ছিল না, সেখানে বিষাদ-ঘন মুহূর্তের মধ্যে পরিচয়ের শেষ চিহ্নগুলো পর্যন্ত লোপ করে দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্য এই বিষাদময় কাহিনীর পশ্চাতে যে জটিল সমস্যা ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না, আর একথাও অস্বীকার করা চলে না যে এ সকলের পিছনে ছিল ট্রট্স্কির কর্মধারা ও চিন্তাধারার ভ্রম। যখন ১৯২২ সালে আমি রাশিয়াতে যাই, জনসাধারণের কাছে ট্রট্স্কি ছিলেন লেনিনের চেয়েও প্রিয়। তখন তিনি যুদ্ধের বিজয়ী বীর, জাতীয় সেনানায়ক। যে বাগ্মিতায় তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সেই অপূর্ব বাগ্মিতাই ছিল তার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। ব্যবহারিক জগতের জীব হ'লে তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকে অক্ষত রাখতে পারতেন। তাঁর এই অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে, রোগশয্যা থেকে লেনিন তাঁকে

'কাউন্সিল অব পিপল্‌স কমিশারের' সহ-সভাপতিত্ব দিতে চেয়েছিলেন—জগতের সামনে লেনিন চেয়েছিলেন ট্রট্‌স্কিকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করতে, আর যদি একবার একথা ঘোষিত হ'ত, ষ্ট্যালিনের অভ্যুত্থান কখনই সম্ভবপর হ'ত না।

কিন্তু ট্রট্‌স্কি নিজেই এই পদ গ্রহণ করতে চান নি। লেনিনের মৃত্যুর পর, চক্রান্ত করে ষ্ট্যালিন যখন তাঁকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি নিজে থেকেই সরে গিয়েছিলেন। লেনিনের যখন মৃত্যু হয়, ট্রট্‌স্কি তখন চলেছিলেন ককেসাসের অভিমুখে। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ফিরে এসে লেনিনের অন্ত্যেষ্টিসভায় কোন অভিভাষণই দেন নি। ষ্ট্যালিন যখন টেলিগ্রাম করে লেনিনের অন্ত্যেষ্টি-দিবসের ভুল তারিখ তাকে জানান, তখন তিনি ষ্ট্যালিনের কথাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। বহুদিন পরে এই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন "আমি তখনই ক্রেমলিনে টেলিগ্রাম করে বল্লাম 'মস্কোতে ফিরে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করছি—অন্ত্যেষ্টির দিন কবে ?' এক ঘণ্টার ভিতর উত্তর এল, 'অন্ত্যেষ্টি হবে শনিবারে, আপনি ঐ সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন না ষ্ট্যালিন'। আমি চাই নি যে শুধু আমার জন্যই পূর্ব-নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু সুকুমে পৌঁছে শুনলাম, অন্ত্যেষ্টি দিবস ঠিক করা হয়েছে রবিবারে।"

আসলে কিন্তু কোন পরিবর্তনই হয়নি। চারদিন ধরে লেনিনের মৃতদেহ রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর ঐ সময়ের মধ্যে ট্রট্‌স্কি দু'গুণ দূরত্ব থেকে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা' চান নি। ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির জন্য বিবাদ করাকে তিনি সকল অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। যখনই প্রতিপত্তিলাভের জন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ত, তিনি ইচ্ছা করেই সরে যেতেন, বলতেন, এতে তাঁর আভিজাত্যে বাধে। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল, তবুও এই বিপ্লবের মন্ত্রপূত পুরোহিত চাননি যে শুধু তাঁরই জন্য তারিখ বা দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

উপরি উপরি দু'বার ক্ষমতালাভের সকল সুবিধা ত্যাগ করে ট্রট্‌স্কি মৌনব্রত অবলম্বন করলেন আর এই সুযোগে ষ্ট্যালিন তাঁর অত্যাচারের

গোড়াপত্তন সুরু করে দিলেন। ট্রটস্কির অনুচরদের এতে হ'ল আশাভঙ্গ, রুশীয় জনসাধারণ হ'ল হতভম্ব, সমস্ত পৃথিবী হ'ল বিস্ময়ে হতবাক্। ১৯২৬ সালে "লেনিনের মৃত্যুর পর' পুস্তকে যখন লোকচক্ষুর সামনে ক্ষমতালাভের জন্য ষ্ট্যালিনের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত করলাম আর "লেনিন টেষ্টামেন্ট" থেকে উদ্ধৃত করে যখন দেখালাম লেনিন ট্রটস্কিকে কার্যকরী সমিতির যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনোনীত করে পার্টিকে ষ্ট্যালিনের ষড়যন্ত্র হ'তে সাবধান হ'তে বলেছেন, আশ্চর্যের বিষয়, ট্রটস্কি তখন আমার পুস্তককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেননি। তিনি আমার মন্তব্যকে অস্বীকার করেন অথচ তিনিই নিজে আমাকে সকল তথ্য জোগাড় করে দিয়েছিলেন, আর এইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি বই লিখবো তিনি জানতেন। তাঁর মুখ থেকে শুনে লেনিনের যে দলীলকে আমি প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছিলাম, সেই দলীলকেই তিনি অস্বীকার করে বসলেন। অবশ্য অনেক দিন পরে তিনি নিজের অস্বীকৃতিকেই আবার অস্বীকার করেন—কিন্তু তখন অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—ষ্ট্যালিন তখন সকল ক্ষমতা নিজের হাতে গুছিয়ে নিয়েছেন। চিরকাল ট্রটস্কিকে অনন্যসাধারণ জননেতা বলে ইতিহাসে লেখা হবে, চিরকালের জন্য মেনে নেওয়া হবে, উজ্জ্বল ইতিহাস-রচনায় এবং উজ্জ্বলতর ইতিহাস-সংগঠনে ট্রটস্কি তুলনাহীন। কিন্তু ইতিহাস এটুকু সাক্ষ্য দেবে, ট্রটস্কি সেই সব মনীষীদের সমগোত্রীয় যাঁরা সকল শক্তির আধার হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।

শেষ পর্যন্ত ট্রটস্কি সোভিয়েট ইউনিয়নের রক্ষাকে মূলমন্ত্র হিসাবে গণ্য করতেন, আর শেষ পর্যন্ত, ষ্ট্যালিনের একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে মজুরের রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে এসেছিলেন, কেননা, তিনি ছিলেন গোঁড়া মার্ক্সবাদী আর মার্ক্সের অনুসারে মজুররাষ্ট্র শুধু পুঁজিবাদীদের ধ্বংস-সাধন করতে পারে। তিনি একসুরে বলে গেছেন, ষ্ট্যালিনের রাশিয়াকে মজুরের রাষ্ট্র হিসাবে রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু ষ্ট্যালিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে বঞ্চনা করে গেছেন। ষ্ট্যালিন ট্রটস্কির আততায়ীর কাছে মৈত্রী করা একটা মন্তব্য রেখে দিয়েছিলেন—সে নাকি

ট্রট্স্কিকে হত্যা করেছিল কারণ ট্রট্স্কি তাকে বলেছিলেন—সোভিয়েট ইউনিয়নকে জাহান্নামে পাঠাও। আততায়ীর কথা প্রত্যেকেই জানেন এবং পড়েছেন, কিন্তু ক'জন আর জানবেন কী গভীর সুরে দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরে ট্রট্স্কি এর প্রতিবাদ করে গেছেন।

'কোনদিনই ট্রট্স্কি ক্ষমতালাভের জন্য লালায়িত হননি। যারা ক্ষমতালাভ করে অসত্যের শরণাপন্ন হয়েছিল, ট্রট্স্কি সকল অন্তর দিয়ে তাদের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। সভাপতি হওয়ার চেয়ে সত্য পথে চলাকেই তিনি সম্মানার্হ মনে করতেন। সত্যপথে চলার জন্য যদি সভাপতিত্ব হারাতে হয়, তিনি সাগ্রহে সভাপতির আসন বর্জন করতে রাজী ছিলেন। এইটে ছিল তার দুর্বলতা। কেউ কেউ বলেন তিনি ভয় করতেন পাছে তিনি বোনাপার্ট হয়ে পড়েন—আমারও ঐ কথা মনে হয়। রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে স্বৈরাচার করাকে তিনি সকল মনপ্রাণে ঘৃণা করতেন।

ট্রট্স্কি স্বেচ্ছায় সকল ক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন, এ কথা যাঁরা বোঝেন তাঁরা আবার বলেন যে ট্রট্স্কি ছিলেন গর্বান্ধ, তিনি নাকি চেয়েছিলেন, সকল ক্ষমতা যেচে তাঁর হাতে অর্পণ করা হোক। "La Vie Orgueilleuse de Trotsky" ব'লে ফ্রান্সে যে বইটা লেখা হয়েছে, তাতেও এই মত পোষণ করা হয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বইটা নিছক পাগলামিতে ভরা। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ট্রট্স্কি প্রশংসা ভালবাসতেন আবার তাঁর যে এই দুর্বলতা আছে তিনি নিজেই জানতেন না। তিনি ভাবতেন তিনি বুঝি "নির্বৈক্তিক"—যা প্রত্যেক মার্ক্সবাদীরই হওয়া উচিত। তাঁর 'রুশীয় বিপ্লবে" সব সময়েই তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রথম পুরুষে কথা বলেছেন। এক জায়গায় বলেন—"এই পুস্তকের রচয়িতা" আবার তখনই বলেন—"লাল ফৌজের অধিনায়ক এই কাজ করলেন" কিন্তু নিজেকে ঢাকতে যাওয়ায় ব্যাপারটা যে নির্বৈক্তিক হওয়া দূরে থাকুক ব্যক্তিত্বের রঙে রাঙিয়ে উঠল, তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না। মনে প্রাণে অহঙ্কারহীন হ'লে ট্রট্স্কি বলতেন— "আমি এই কাজ করলাম।" কিন্তু ট্রট্স্কি নিজের দুর্বলতার সন্ধান রাখতেন না। সামান্য সত্যের সঙ্গে চাটুবাদ মিশিয়ে তাই তাঁকে ভোলানো

যেতো। কিন্তু সব সময়ে নয়—কর্তব্যের কালে তিনি ছিলেন অনমনীয়। তাঁর অহঙ্কার ছিল বাইরের আবরণমাত্র, মজ্জাগত নয়।

আমার মনে হয় ট্রট্স্কি স্বেচ্ছায় সকল ক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি জানতেন, হাতে ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমতা-ব্যবহারে তিনি অক্ষম। তিনি মানুষকে নিয়ে কারবার করতে পারতেন না। তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল আদর্শের জগৎ, মানুষের জগৎ নয়। সাধারণতঃ রাজনীতিজ্ঞ বলতে যা বুঝি, ট্রট্স্কি সেই গোত্রের একেবারেই ছিলেন না। সাধারণ রাজনীতিজ্ঞদের মত তিনি ধূমপান বা মদ্যপান করতেন না, তাদের মত কথায় কথায় শপথ করতেও তিনি পারতেন না। চেষ্টা করেও কোন দিন অশ্লীল ভাষা তিনি মুখে আনতে পারেন নি। 'লেনিন টেষ্টামেণ্ট' পড়ে ষ্টালিন যে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সে কথা তিনি বলতেই পারেন নি। প্রকাণ্ড আয়তনের বিশেষ বিশেষণ প্রয়োগ করে তবে তিনি কোনমতে আমাকে ষ্টালিনের ভাষার সামান্য পরিচয়মাত্র দেন।

আমার মনে আছে, ট্রট্স্কি যাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন, তাদের দলে বহু পূর্বে যোগদান করার জন্য, তাদের পরিচালনা করলেও, তারা তাঁকে আপন-জন ব'লে মেনে নিত না। কিন্তু তাঁর সকল পরিচয় পেয়েও কেন তারা তাঁকে দূরে দূরে রাখতো? কেন তিনি বলশেভিক পার্টির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পারেন নি?

প্রথমেই মনে নেওয়া যাক, ট্রট্স্কির সাহসিকতার তুলনা মেলে না। পর পর দুটি গভর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যভাবে তিনি তাদের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করছিলেন। সঙ্কটময় জুলাই মাসে জারের লোক-লস্কর যখন বলশেভিকদের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি লেনিনের মত গুপ্তভাবে চলাফেরা করতে অস্বীকৃত হন। লাল ফৌজের সেনানায়ক-রূপে বার বার বন্দুকের গুলির সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কতো কঠোর সমালোচনা তাঁকে শুনতে হয়েছে। শয্যায় যারা মৃত্যুবরণ করে নেন তিনি তাঁদের মত সেনানায়ক ছিলেন না। এই সব অলোকসামান্য গুণের জন্য জনসাধারণ তাকে দূর থেকে সম্মান করতো, কিন্তু কাছে এসে নিজের বলে মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু বন্ধুত্ব স্থাপনের শক্তি থাকলে এ সবে কিছু এসে যেতো না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শক্তিটও তাঁর ছিল না। আমার মনে হয়, শান্ত ও চিন্তাশীলা সহধর্মিণী ব্যতীত তাঁর বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। তাঁর অনুচরেরা তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করতো, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারেও ট্রট্স্কি সহিষ্ণুতা ও হৃদয়শীলতার পরিচয় দেননি। তাঁর মনোরম ব্যবহারে আকৃষ্ট হ'য়ে অনেক পরিচিত ব্যক্তিও এসেছিলেন। কিন্তু নিকট ব্যবহারে তিনি প্রত্যেককেই ক্ষুব্ধ করে তুলতেন। তাঁর কর্মকুশলতা ও চিন্তা-কুশলতায় মুগ্ধ হ'য়ে বহু শক্তিশালী লোক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সহানুভূতিশীল, কল্পনা ও আত্মজ্ঞান না থাকার জন্য নিবিড় অন্তরঙ্গের কাছে তাঁকে জড়পদার্থের মতো মনে হোত। সমস্ত রাত্রি ধরে তিনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন সকল বিষয়েরই সম্বন্ধে, কিন্তু ভোরের বেলায় বাড়ী ফিরে যাবার সময় মনে হোত তিনি বুঝি একটা কথাও বলেন নি। সারা রাত্রি তাঁর সঙ্গে বসে থাকলেও একটি বার পর্যন্ত তাঁর ঈষৎ-নীল চোখের ক্ষণিক দ্যুতিও পাওয়া যেতো না, কোনো মুহূর্তেই তাঁর হাসি শোনা যেতো না। মনে হ'ত, তাঁর কথায় আছে বুদ্ধির প্রখরতা, কিন্তু বন্ধুত্বের উষ্ণ স্পর্শে তা সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে নি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলতে পারি।

যাঁরা ট্রট্স্কিকে দেখতে পারতেন না, তারা বলতেন ট্রট্স্কি অভিনয় করেন। কিন্তু এটা ঠিক, ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লে ট্রট্স্কি কখনো অভিনয় করতেন না। তাঁর আদর্শ প্রীতি ছিল সহজ এবং গভীর। আদর্শ তাঁর সকল সাত্মাকে প্রভাবান্বিত করছিল। আদর্শ ছাড়া অবশ্য তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার ছাড়া আমার মনে হয় তাঁর আর কোনো জিনিষই তাঁর জীবনে ছাপ রাখতে পারে নি, আর তাই ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে অভিনেতা বলেই মনে হ'ত।

ট্রট্স্কি লোককে কথা দিয়েই ভুলে যেতেন, লেনদেন ব্যাপারে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন আর অপর পক্ষের পাওনার বিষয় ভুলতে তাঁর খুব বেশী সময় লাগতো না। তিনি প্রিনকিপোতে উপস্থিত হবার

পর আমেরিকার সাংবাদিক ও পুস্তক-প্রকাশকরা তাঁকে ঘিরে ফেল্লেন, তখন আমি আমেরিকায় তাঁর এজেন্ট হই। মনে আছে, অনেক সময়ই আমার কেটে যেতো তাঁর প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তি নাকোচ করবার জন্য, আর তিনি কিছু না দেখেই এই সব ব্যাপারে বেমালুম সই করে দিতেন। আমার ধারণা, তিনি ভাবতেন আসল বৈপ্লবিকের এই রকমই ব্যবহার করা উচিত, পরক্ষণেই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে তিনি রেহাই পাবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতেন। যাই হোক, এই দুই বৎসর আমাকে গলদঘর্ম হ'য়ে খাটতে হয়েছে।

বৃদ্ধ রকফেলার বলতেন, 'লোকের সঙ্গে সুষ্ঠু ব্যবহারকে' আমি অন্য সবলের চেয়ে উচুতে স্থান দিই আর এই সুষ্ঠু ব্যবহারের গোড়ার কথা হচ্ছে মানুষকে মানুষ হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে, তাকে পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যতই চেষ্টা করুন না কেন, ট্রট্‌স্কি এ কথা বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারতেন না। যে সকল লোক তাঁর হাতে কলের পুতুলের মত ব্যবহার না করতো, তাদের তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কি করে বন্ধুর প্রীতি হারাণ যায়, এ বিষয়ে ট্রট্‌স্কির জীবন হচ্ছে এক অখণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাস। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কিন্তু তাহ'লেও কিছু বলা দরকার মনে করি।

১৯৩২ সালে যখন আমি প্রিন্‌কিপোতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম, আমাদের একটা আমোদ ছিল তাঁর কিম্ভূতকিমাকার ইংরাজী ভাষায় চিঠিগুলোর নোট নেওয়া। যদিও ব্যাকরণ বলে সে চিঠিগুলোতে কিছু ছিল না, তবু শব্দসম্ভার ছিল অপূর্ব। একদিন তিনি ইণ্ডিয়ানা-নিবাসিনী কোন মহিলার চিঠি আমার হাতে দিলেন। মহিলাটি ট্রট্‌স্কিকে তার রাশিয়া-বাসী আত্মীয়দের খোঁজখবর নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ট্রট্‌স্কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'এঁর নাম জানেন?' আমি বল্লাম 'না, কেউ একজন হবে বোধ হয়।' মনে হ'ল তাঁরও সেই মত। আমি চিঠিটাকে পাকিয়ে বাক্সে ফেলে দিতে যাব এমন সময় তিনি এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন আমি একটা শিশুর মুখ মাড়িয়ে থেঁৎলে দিচ্ছি।

"দেখছি, এই রকম করে তাহলে আপনি চিঠিপত্রগুলোর সদ্‌গতি

করেন। জানেন, আমার সেক্রেটারীকে ঐ চিঠিটা দেওয়া দরকার, সে ওটাকে ফাইলে রেখে দেবে।"

আমি চিঠিটাকে সোজা করে ওঁর সামনে ধরলাম, হেসে বল্লাম. "প্যারিস ও ভিয়েনাতে কপর্দকহীন ভাবে যখন আপনি লোককে ক্ষেপিয়ে বেড়াতেন, তখনও কি ফাইল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো নাকি? আমি তো কোন সেনানায়ক নই। আমি হচ্ছি গরীব লেখক।"

তিনি হেসে ফেল্লেন, বল্লেন "যতদূর পারা যায়, জিনিষগুলোকে ঠিক করে রাখা দরকার তো?"

আসলে ব্যাপারটা খুব খারাপ মনে হয় নি। কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যে অন্য কথা উঠলো। আমি তখন মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের জন্য বাহির হচ্ছিলাম। তিনি একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন আর তার তর্জমার ভার পড়েছিল আমার উপর। আমি বল্লাম 'তর্জমাটা ট্রেনে বসেই করবো, আর তারপর জেরুসালেম থেকে নিউ ইয়র্কে কোন পুস্তক-প্রকাশককে পাঠিয়ে দেব।"

তিনি বল্লেন "পুস্তক প্রকাশকই বরং তর্জমা করবার ব্যবস্থা করুক না।" আমি বল্লাম "রাশিয়ার যে রকম ভাল কোন লোক নেই, বিশেষ করে ব্যবসাদার প্রকাশক যে কোন লোককে জোগাড় করতে পারবে বলে বিশ্বাস বা ভরসা করি না।"

তিনি বল্লেন ইউরোপ আর এসিয়াতে আমার প্রবন্ধ ঘুরে বেড়াবে, এ আমি চাই না।

আমি বল্লাম আপনার পুস্তক-প্রকাশক এর তর্জমার জন্য ক্যানাডা বা সান ফ্রানসিস্কোতে পাঠাবে বলে মনে হয় না।

তিনি বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন। চেঁচিয়ে বল্লেন যারা চিঠিগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ফেলে দেয়, আমি চাই না, তারা আমার লেখার তর্জমা করুক।

তিনি বেশ রেগেই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জন্য আমি যা করেছি, সেই হিসাবে এটা চরমভাবে অন্যায়। ট্রট্স্কি এবং বোধ হয় সেক্সপীয়র ছাড়া আমি অন্য যে কোন লোককে বলতাম—'জাহান্নামে যাক আপনার লেখা,

আমি চল্লাম।' কিন্তু হঠাৎ লেনিন টেষ্টামেন্টের কথা মনে পড়ে গেল। শুদ্ধ রাশিয়ান ভাষায় বল্লাম—"নিয়েক ডাভিডোভিচ', লেনিনের ভাষায় আমি উত্তর দেব 'কমরেড ট্রট্স্কি কাজ চালানো ছাড়া আর কিছু জানে না।"

তিনি খোঁচা খেয়ে হো হো করে হেসে উঠে চেয়ারে গড়াতে লাগলেন। দু' মিনিটের ভিতর আলোচনার মোড় ঘুরে গেল আমরা দু'জনে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করব।

তিনি বল্লেন "আপনার আছে কল্পনাশক্তি আর গৃহযুদ্ধ কি আমার আছে জানা।" সত্য কথা বলতে কি, ট্রট্স্কি যে বাস্তববাদী মোটেই ছিলেন না, এর দ্বারা খুবই সহজে প্রমাণিত হয়।

লেনিনের ছিল বীশক্তি ও আদর্শবাদ, আর তারই সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক কলাকৌশল। এই গুণগুলো ভাগ হ'য়ে গিয়েছিল ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের মধ্যে ট্রট্স্কি পেয়েছিলেন লেনিনের বীশক্তি ও আদর্শবাদ আর ষ্টালিন পেয়েছিলেন তার রাজনৈতিক কৌশল। ষ্টালিন ট্রট্স্কিকে আঘাত করতে গেলে ট্রট্স্কি যে সকল পথ অবলম্বন করেছিলেন, তার কোনোটাকেই কাজের বলা চলে না। যখন ষ্টালিন তাঁর রচনার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তাঁকে নিন্দনীয় করে তুলেছিলেন, তখনও তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। ধরে নিলাম, তার কোন একটা অদ্ভুত অসুখ করেছিল, কিন্তু এটা যদি ব্যক্তিগত কলহ না হয়ে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ বিক্ষোভ হ'ত তখন কি তার অসুখ সেরে যেতো না? ট্রট্স্কি সহজেই করতে পারতেন। ছিল তার প্রচণ্ড বাগ্মিতা। মস্কো ও লেনিনগ্রাডের সকল মজুরকে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে পারতেন, কিন্তু এ কথা জেনেও তিনি তা করেন নি, কেননা তাহলে আরম্ভ হ'ত গৃহযুদ্ধ। লেনিন এই অবস্থায় এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন, কেননা তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। কিন্তু ট্রট্স্কি ভাবতেই পারতেন না যে শোষক-শোষিতদের ছাড়া আর কোন রকম যুদ্ধ হ'তে পারে।

ট্রট্স্কি ছিলেন সাধারণ নীচতার অনেক উর্ধ্বে—তাই যখন রাগ হওয়া উচিত তখন শুধু তিনি হ'তেন বিরক্ত। আমার মনে আছে, তাঁর স্ত্রী একদিন অশ্রুভরা চোখে আমাকে বলেছিলেন যে ট্রট্স্কিকে লক্ষ্য করে

যে কটাক্ষ করা হয়, তা তিনি কখনো পড়তেন না। "নোংরামি তিনি সহ্য করতে পারেন না।"

১৯২৪ সালের শীতকালে সুবিধা পেয়ে ষ্টালিন দলের সকলকে নিজের হস্তগত করে ফেল্লেন, সংবাদপত্রের সুর দিলেন বদলে। জুন মাসে যখন সকলে সম্মিলিত হ'ল, সকলেই ষ্টালিনের মুঠোর মধ্যে। তখন ট্রটস্কি বেরিয়ে এলেন তাঁর যুগব্যাপী মৌনতা থেকে—কিন্তু তাঁর এবং লেনিনের কর্মধারার স্বপক্ষে বলার জন্য নয়—শুধু এক কূট বক্তৃতা করবার জন্য।

তিনি বল্লেন "পার্টি কখনো ভুল করে না।"

অদ্ভুত শোনালেও, ঠিক এই কথাই তিনি বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করতে তিনি প্রস্তুত আছেন যদি সেই যুদ্ধ হয় বিপ্লবের জন্য।

একজন লোক চীৎকার করে বলেছিল "কম্‌রেড ট্রটস্কি, আপনার কাছ থেকে কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম অন্য জিনিষ। আমরা চেয়েছিলাম আপনার নেতৃত্ব।"

সত্য কথা বলতে কি, এ রকম হঠকারী বক্তৃতা আমি কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। পর দিন আমি রাশিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়ী গিয়ে আপনি কি করবেন?"

"বই লেখা ছাড়া আর অন্য কিছু করবার ইচ্ছা নেই।"

তিনি মুচকে একটু হাসলেন।

আমি বল্লাম "আমি শ্রেণীযুদ্ধে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু শান্তিও আমি চাই।"

তিনি বল্লেন "আপনি শান্তি চান? আপনাকে বন্দী করা উচিত।"

আমি মৌনসম্মতি দিলাম হেসে। সেই আমাদের শেষ কথা। কিন্তু ঠিক তারই পরে তিনি এই ভয়ানক ভুল বক্তৃতাটি দিলেন। আমি বাধ্য হয়ে গিয়ে তাঁকে কোণে টেনে আনলাম, বল্লাম, আমার মতে কি করলে তাঁর ভাল হয়। বল্লাম "কি আশ্চর্য, আপনি চুপ করে রইলেন কেন? যান যান, লেনিন টেষ্টামেণ্ট ওদের পড়ে শোনান। ষ্টালিন দলীলটা চেপে

যাবে আব আপনি চুপ করে থাকবেন, এ কি বকম? আব ব্যাপাবটা আপনাব নিজেবও কিছু নয়। এ যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবেব, কোন ব্যক্তিবিশেষেব নয়। এই আপনাব শেষ সুবিধা। এখন কিছু না করলে, জানবেন, কখনই কিছু করতে পাববেন না।"

তিনি অবাক হয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে বইলেন। কিছুক্ষণেব জন্য আমাব কথাগুলো ভেবে দেখলেন। তাবপব বল্লেন "আপনি না বল্লেন আপনি শান্তি চান?"

তখন আমাব কয়েকজন অভিজ্ঞ বলশেভিকেব মন্তব্য মনে পড়ল—ট্রট্স্কিব কর্মপদ্ধতি ঠিক হ'লেও, তিনি কখনো লেনিনেব আসন নিতে পাববেন না। কর্মপদ্ধতি নিয়েই তাদেব কলহ, ট্রট্স্কিব নেতৃত্ব নিয়ে নয়।

আমাব মনে হয় ট্রট্স্কি নিজেও একথা বুঝতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম. "আচ্ছা, লেনিন, যখন আপনাকে সমস্ত ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন, আপনি নেন নি কেন?"

তিনি বল্লেন—"ষ্ট্যালিন, জিনোভিয়েভ ক্যামেনেভ সকলেই তখন আমাব বিরুদ্ধে। পোলিতব্যুবোব বেশী ভাগই যখন আমাব বিপক্ষে, আমাব পক্ষে কাজ করা কি করে সম্ভবপব হ'ত?"

লেনিনেব উত্তবাধিকাবী হয়েও ট্রট্স্কি সকল ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা, ক্ষমতা দখল ব্যাপাবে তিনি ছিলেন অক্ষম। তিনি প্রকাশ্যে এ কথা অস্বীকার করলেও আপন মনে ব্যাপাবটা বুঝতেন। তিনি মানুষেব হৃদয় জয় করতে পাবতেন, তিনি বিবাট বাহিনীব অধিনায়কত্ব করতে পাবতেন, দূব থেকে তিনি জনগণেব মধ্যে উন্মাদনাব সঞ্চাবও করতে পাবতেন। কিন্তু শক্তিশালী লোককে বন্ধু হিসাবে জয় করে ধবে বাখতে তিনি কোনদিনই পাবতেন না। আমাব মনে হয় তাঁব জীবনেব অভ্যুত্থান পতনেব মূলে ছিল এই সব কারণ। তিনি গৌরবেব শৈলশিখবে উঠেছিলেন অন্য নেতাব সাহচর্য লাভ করে, আব যখন যুদ্ধ-বিপ্লবেব ঘনঘটাব মাঝে তাঁব নেতৃত্বেব প্রয়োজন হ'ল, তখন তাঁব অনিবার্য পতন হ'ল অবিশ্বাস্য তড়িৎ গতিতে।